স্বাস্থ্য

তৃতীয় ভা

ব

(সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বালকদিগের জন্য)

॥

ভূমিক

দেহ অপেক্ষা মানবের অধিকতর প্রিয় বস্তু আর কি আছে? মানব জীবন নানা সুখের আধার। কিন্তু পীড়া হইলে কিছুই ভাল লাগে না, খাদ্যে অরুচি হয়, কার্যে আসে, মন অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং সংসার বিষবৎ বোধ হয়। চিররুগ্ন হইয়া বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিতে হইলেও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকা আবশ্যক। সত্য বটে, দেশের জলবায়ুর উপর স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভর করে, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থাতেও যথোচিত যত্ন ও চেষ্টা করিলে যথেষ্ট উপকার হয়। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখিবার নিয়ম ও উপায় না জানায় অনেক বালক-বালিকাকে স্বাস্থ্যহীন হইতে দেখা যায়। আবার নিতান্ত অবহেলা করিয়াও অনেকে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলে।

আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছে যাহাদের ধারণাই হয় না যে, যে বায়ু তাহারা শ্বাসের সহিত গ্রহণ করে, যে জল তাহারা পান করে, যে সকল খাদ্য তাহারা ভোজন করে, তাহাদেরই ভিতর কত ব্যাধির বীজ নিহিত থাকিতে পারে। আর ঐ সকল ব্যাধি যে তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র, গাত্রচর্ম, মলমূত্র, নিষ্ঠীবন ও নিশ্বাসের সহিত অন্যত্র পরিচালিত হইতে পারে তাহা তাহারা বুঝে না। সামাজিক

রীতিনীতি, আচার[illegible]য়, নিবাসভূমি, গৃহ, জনতা, জল, বায়ু প্রভৃতির সহি[illegible] ব্যাধি সংক্রমণের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিতে পারে তাহ[illegible] তাহারা বুঝিতে পারে না। তাই কোন ব্যাধি মহামারী[illegible]পে প্রকাশ পাইলে প্রকৃত কারণ স্থির করিতে না পারি[illegible] আপনাদের অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে।

এই অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন অবস্থা দূর করিতে হইলে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র স্বাস্থ্যবিদ্যার অনুশীলন ও প্রচার আবশ্যক। বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকগণের প্রদর্শিত পথে চলিলে দীর্ঘকাল সুস্থদেহে জীবন উপভোগ করা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বাস্থ্যবিদ্যা বা হাইজীন (Hygiene) অনুশীলনে আমরা জানিতে পারি কিরূপ স্থানে বাস করা উচিত, কি আমাদের সুপথ্য, কি কুপথ্য, কিরূপ জল পান করিলে স্বাস্থ্যহানি বা প্রাণের আশঙ্কা হয় না, কোন্ জল দূষিত এবং কিরূপে জল কলুষিত হয়, কি ভাবে বাসগৃহ নির্মাণ করা উচিত, জনতাপূর্ণ ও অপরিষ্কার স্থানে বাস করা কেন বিপজ্জনক। ইহার দ্বারা আমরা আরও জানিতে পারি আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি কিরূপ হওয়া চাই, ব্যায়ামের কি প্রয়োজন, দেহ ও মনের পক্ষে বিশ্রাম কিরূপ হিতকর, নিদ্রার উপকারিতা কি, মাদক দ্রব্যের অপকারিতা কি ইত্যাদি। বস্তুত কি উপায়ে নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবন যাপন করা যায় এবং শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে, স্বাস্থ্যবিদ্যা হইতেই তাহার জ্ঞান লাভ করা যায়।

বাড়ী, ঘর, রাস্তা, নালা, ।, আস্তাবল ও গোয়ালঘর নির্মাণ করা ও পরিষ্কার এবং শহর ও পল্লীগ্রামে আবর্জনা ও ময়লা দূরীকরণের সুব্যবস্থা করা সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষাবিধির অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত পানীয় জলের ব্যবস্থা, বায়ু ও [illegible] যাহাতে দূষিত না হয় তাহার বিধান, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নিবারণ, সংক্রামক রোগ উৎপন্ন না হইতে পারে বা চতুর্দিকে বিস্তার না পায় তাহার উপায় বিধান করা ও সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা বিধির বিষয়ভুক্ত। সমাজে বাস করিতে হইলে এ সকল বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক এবং পরস্পরের হিতার্থে সকলেরই যথাসাধ্য বিধিনিয়মাবলী মানিয়া কর্তব্য পালন করা উচিত।

বাংলা বানান সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মাবলী এই পুস্তকে পালন করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার।

সূচী

(সপ্তম শ্রেণী

(অষ্টম শ্রেণী)

অধ্যায়	বিষয়.		পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

মানবদেহের গঠন ও কার্যপ্রণালী

মানবদেহ গঠনে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া মনে বিস্ময় উপস্থিত হয়। মানুষের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও কার্যাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যেখানে যেটি যেভাবে থাকিলে উহার ক্রিয়া সুশৃঙ্খলায় হয়, ঠিক সেখানে সেই ভাবেই উহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আশ্চর্য কৌশলে নির্মিত হইয়া মানবদেহ একটা বিরাট ও বিচিত্র কলের মত কার্য করিয়া চলিয়াছে। একটি ঘড়ির সহিত মানবদেহের অনেকটা তুলনা করা যায়। ঘড়িতে দম দিলে যতদিন উহার দম না ফুরায় ততদিন যেমন উহা দিনরাত্রি চলিতে থাকে, তেমনি মানবদেহে যতদিন জীবনীশক্তি থাকে ততদিন উহার সকল ক্রিয়া অবিরত চলে। ঘড়ির দম ফুরাইলে বা উহার কোন অংশ ভাঙিয়া গেলে যেমন তাহা বন্ধ হইয়া যায়, তেমনি জীবনীশক্তি নিঃশেষ বা দেহের যন্ত্রাদি নিজ স্বাভাবিক ক্রিয়া করিতে অক্ষম হইলে

মানুষের দেহও নষ্ট হ[illegible]। যতদিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শারীরিক যন্ত্রাদি সবল ও সুস্থ [illegible]কিয়া নিজ নিজ কার্য নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন করে ততদিন আ[illegible]দের দেহের কার্য বেশ চলিয়া যায়।

ঘড়ির সহিত [illegible]র দেহের তুলনা করিলাম বটে, কিন্তু মানবদেহে এমন [illegible]ি ক্রিয়া হয় যাহা প্রাণহীন যন্ত্রে বা অচেতন পদার্থে কখন সম্ভব হয় না। যাবতীয় প্রাণীর মধ্যেই এমন কয়েকটি সাধারণ গুণ ও ক্রিয়া দেখা যায়, যেগুলি দ্বারা অন্য পদার্থ হইতে তাহাদের পার্থক্য সহজেই বেশ উপলব্ধি করা যায়। সাধারণত সকল প্রাণীরই সঞ্চলন ও গমন-শক্তি (motion and locomotion) আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়িতে চড়িতে পারে। প্রাণীমাত্রেই জীবনধারণের জন্য খাদ্যদ্রব্য হইতে পুষ্টি (nutrition) গ্রহণ করিতে পারে। সকল প্রাণীরই ভিতর জনন-শক্তি অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি (reproduction) করিবার ক্ষমতা নিহিত আছে এবং সেজন্য তাহাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আবার প্রাণিদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির স্বাভাবিক ক্রিয়া নার্ভের সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য (innervation) সুন্দর ব্যবস্থা আছে। মানবদেহে এই সকল ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহার আশ্চর্য সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব বুঝিতে হইলে মানবদেহ কিরূপে গঠিত ও তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কিভাবে কার্য চলিতেছে তাহার জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু এস্থানে প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্যক বর্ণনা করা সম্ভব নহে; কেবল অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(১) নরকঙ্কা[ল]

মাটির প্রতিমা গড়িতে হইলে যেমন তাহার ভিতর কাঠাম দিতে হয়, আমাদের দেহের ভিতরেও তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। আমাদের গাত্রের উপর চর্ম্ম-মাংসের নিম্নে টিপিলে যে কতকগুলি অস্থি আছে তাহা বেশ বুঝা যায়। এই সকল অস্থির সংযোগে সমস্ত দেহের মধ্যে একটি কাঠাম তৈয়ারি হইয়াছে; ইহাকেই কঙ্কাল বলে। শরীরতত্ত্ব অনুশীলনে জানা যায় যে, দুই শতেরও অধিক ছোট বড় অস্থি দ্বারা এই কাঠাম নির্ম্মিত। ইহার একটি প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। আমাদের দেহের ভিতর এই দৃঢ় ও কঠিন কঙ্কাল আছে বলিয়াই আমরা দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে পারি এবং ইহাই আমাদের শরীরের বিশিষ্ট আকার প্রদান করিয়াছে।
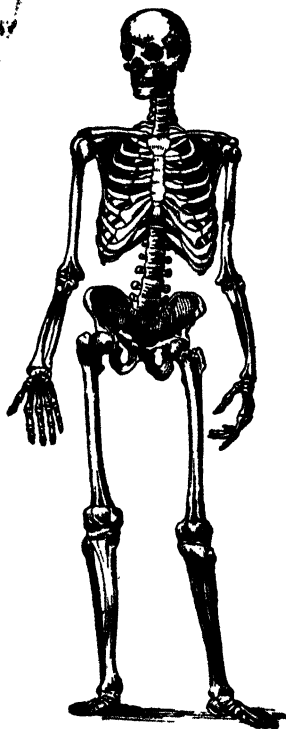
নরকঙ্কাল

একটু মনোযোগের সহিত এই কঙ্কালের প্রতিকৃতি দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, উহা চারি অংশে ভাগ করা যাইতে পারে,

যথা —(১) করোটি (s[illegible]), (২) দেহকাণ্ড (trunk), (৩) ঊর্দ্ধ্ব শাখাদ্বয় (hands), ও (৪) নিম্ন শাখাদ্বয় (legs)। *

করোটি।—করোটি বা মাথার খুলি বাইশখানি অস্থির সংযোগে গঠিত হইয়াছে। উহার ভিতরে মস্তিষ্ক (brain) এমন ভাবে আছে যে সহজে তাহাতে আঘাত লাগিতে পারে না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং মুখ ইহাতে অবস্থিত।

দেহকাণ্ড।—দেহের পিছন দিকে অবস্থিত মেরুদণ্ড, দুই পার্শ্বের পাঁজরা, বক্ষঃস্থলের অস্থি এবং তলপেটের বা কটি প্রদেশস্থ অস্থিগুলি দ্বারা দেহকাণ্ড গঠিত হইয়াছে। এই সকল অস্থির সংযোগে মেরুদণ্ডের সম্মুখে যে গহ্বর নির্মিত হইয়াছে তাহারই ভিতর মানবদেহের অনেকগুলি আবশ্যক যন্ত্রাদি আছে। ডায়াফ্রাম (diaphragm) নামক বিস্তৃত মাংসপেশী দ্বারা দেহকাণ্ডের এই গহ্বর দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। উপরের ভাগটি বক্ষঃস্থল এবং নিম্নের ভাগটি উদর ও তলপেট।

---

* বিশেষ দ্রষ্টব্য—এখানে বিবৃত বিষয়গুলি বালকদিগকে বুঝাইতে হইলে একটি "স্কেলিটন্" (skeleton) সম্মুখে থাকা আবশ্যক এবং সম্যক দেহের বিভিন্ন "মডেল" (model) সংগ্রহ করিতে পারিলে বুঝাইবার সুবিধা হয়। যেমন ম্যাপ (map), গ্লোব (globe) ইত্যাদির সাহায্য ব্যতীত ভূগোল পড়া যায় না, তেমনি পূর্বোক্ত দ্রব্যাদির সাহায্য না লইয়া দেহের গঠনপ্রণালী হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। আজকাল দেশে নানাবিধ মডেল তৈয়ারি হইতেছে এবং দামও বেশি নহে। শিক্ষকেরা যদি পূর্ব হইতে আলোচ্য বিষয়গুলি সম্যক আয়ত্ত করিয়া না থাকেন তাহা হইলে ছেলেদের শিখান অসম্ভব। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক মডেলের সাহায্যে অল্প আয়াসে সমস্ত বুঝাইতে পারিবেন। কর্তৃপক্ষদের এবিষয়ে আবশ্যক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

মেরুদণ্ড।—কতকগুলি ...াবেশে মেরুদণ্ড গঠিত। গণনায় ইহাতে তেত্রিশ খানি অস্থি পাওয়া যায়। এগুলি একটির পর আর একটি করিয়া বসান থাকে। কতকগুলি সুতার কাটিমের মধ্যবর্তী ছিদ্রের ভিতর দিয়া এক-গাছি দড়ি চালাইয়া সে-গুলিকে একত্র বাঁধিলে যেমন হয়, মেরুদণ্ডের অস্থিগুলিও কতকটা সেইভাবে সাজান। মেরু-দণ্ড মস্তকের চাপ বহন করে। মাথায় মোট স্থাপন করিলে সেই গুরুভার বহনের ক্ষমতা এই মেরুদণ্ডের শক্তির উপর নির্ভর করে। মেরু-দণ্ডের অস্থিগুলির মাঝে মাঝে একপ্রকার স্থিতি-স্থাপক দ্রব্য থাকায় সহজে ইহার কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। এই অস্থিগুলি পূর্বোক্তভাবে
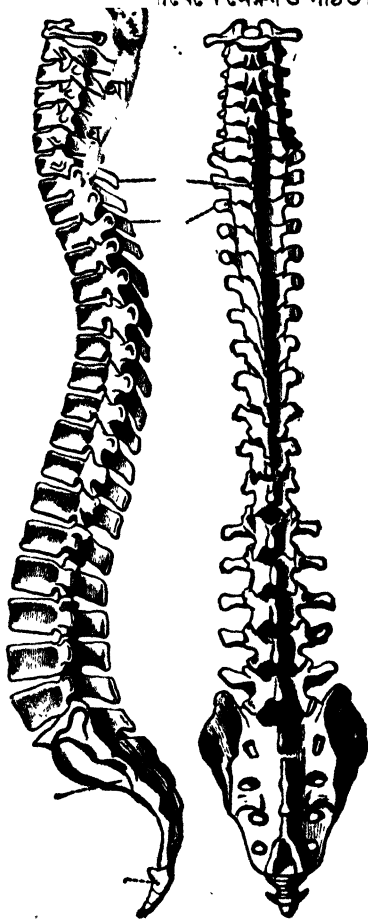
(পার্শ্ব হইতে) মেরুদণ্ড (পশ্চাৎ হইতে)

স্থাপিত হওয়ায় মেরু[illegible]জে বাঁকান ও হেলান যায়। মেরু-দণ্ডের মাঝখান দিয়া বরাবর একটি ছিদ্র পথ আছে। তাহার ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক হইতে সুষুম্নাকাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড (spinal cord) নামিয়া গিয়াছে। এই সুষুম্নাকাণ্ডের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে, আহত স্থানের নিম্নে অবস্থিত দেহাংশ অবশ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ কাণ্ড সুরক্ষিত থাকায় বাহির হইতে শীঘ্র কোন আঘাত তাহাতে লাগিতে পারে না।

বক্ষঃস্থলের দুইধারে বারখানি করিয়া চব্বিশখানি অস্থি মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত আছে। উহাদের নাম পর্শুকা বা রিব (rib)। উহাদের মধ্যে দশখানি করিয়া দুই দিকে কুড়িখানি বক্ষের সম্মুখে অবস্থিত উরঃফলক বা স্টার্নম (sternum) নামক অস্থির সহিত মিলিত হইয়াছে। এইরূপে যে গহ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার নাম বক্ষঃস্থল বা থোরাক্স (thorax)। উহারই ভিতর ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড এবং তাহাদের সহিত সংলগ্ন বড় বড় শিরা ও ধমনী অবস্থিত আছে; অন্ননালী ইহার ভিতর দিয়া পাকস্থলীতে গিয়াছে। বক্ষঃস্থল এমনভাবে নির্মিত যে চলাফেরার সময় আমাদের অসুবিধা হয় না এবং তাহার মধ্যস্থিত যন্ত্রাদি অনায়াসে নিজ নিজ কার্য করিতে পারে।

বক্ষঃস্থলের নীচে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের সম্মুখে উদর-গহ্বর অবস্থিত। এই উদর-গহ্বরের নীচের অংশকে তলপেট বলা হয়। উদর-গহ্বরে পরিপাক যন্ত্রাদি, যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রযন্ত্র ইত্যাদি থাকে। স্ত্রীলোকের দেহে তলপেটের মধ্যে জরায়ু অবস্থিত।

ঊর্ধ্ব শাখাদ্বয়।—আমাদের স্কন্ধদেশ হইতে দুইধারে দুই

খানি বাহু বা হস্ত ঝুলিয়া আছে; ইহাকেই দেহকাণ্ডের ঊর্ধ্বশাখা বলা হয়। গ্রীবার বামে ও দক্ষিণে অক্ষক বা ক্লাভিকেল (clavicle) এবং অংসফলক বা স্কাপুলা (scapula) নামক দুইখানি অস্থি দ্বারা হস্ত দেহকাণ্ডের সহিত সংলগ্ন আছে। আমাদের গলায় ও পিঠে হাত দিয়া টিপিয়া দেখিলে এই অস্থিগুলির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। স্কাপুলা হইতেই প্রধানত স্কন্ধদেশ গঠিত। উহা ত্রিকোণাকার অস্থি; হস্ত ও স্কন্ধদেশ চালনাকালে ইহা বেশ বুঝা যায়। ক্লাভিকেল এক প্রান্তে বক্ষের সম্মুখে অবস্থিত স্টার্নম নামক অস্থির সহিত মিলিয়াছে এবং ইহার অপর প্রান্ত স্কাপুলা অস্থিতে যাইয়া পড়িয়াছে। স্কাপুলার একপ্রান্ত স্কন্ধের সন্ধিস্থলে অবস্থিত এবং তাহা হইতে হস্ত ঝুলিয়া আছে। ইহা এরূপভাবে গঠিত যে আমরা সহজে নানাভাবে আমাদের হস্ত চালনা করিতে পারি।

বাহুর ঊর্ধ্বাংশের অস্থিখানি লম্বা ও সরু; উহার নাম হিউমেরস (humerus)। উহার পরে দুইখানি সরু ও লম্বা অস্থি আছে, তাহাদের নাম বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি বা রেডিয়স (radius) ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি বা অল্না (ulna); এই দুইখানি অস্থি দ্বারা নিম্নবাহু গঠিত হইয়াছে। বাহু ও নিম্নবাহুর সন্ধিস্থলের নাম কনুই (elbow), এবং নিম্নবাহু যেখানে হাতের তালুর সহিত মিলিয়াছে তাহাকে মণিবন্ধ বা কব্জি (wrist) বলে। এই কব্জিতে আটখানি করিয়া ছোট ছোট অস্থি আছে। হাতের পাঁচটি আঙ্গুলে ১৪ খানি ছোট ছোট অস্থি আছে।

নিম্নশাখাদ্বয়।—দেহকাণ্ডের নিম্নদেশে কটি প্রদেশস্থ

অস্থিসমূহ সর্বাপেক্ষা [illegible] এবং দেহের সমুদায় ভার বহন করিতে সক্ষম। দুই ধারের [illegible]টির অস্থি পিছন দিকে মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এবং সম্মুখ দিকে পরস্পরের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। এই কটির বা[illegible] ও দক্ষিণে পদদ্বয় সংলগ্ন ; ইহাকেই নিম্নশাখা বলা হয়। পদদ্বয়ের উপরের ভাগে বা উরুদেশে একখানি করিয়া লম্বা শক্ত অস্থি আছে, তাহার নাম উর্বাস্থি বা ফিমার (femur) ; ইহাই দেহের সর্বাপেক্ষা লম্বা অস্থি। ইহার উপর দিকের গোলাকার প্রান্তটি কটির সন্ধিস্থানের (hip-joint) গর্তের ভিতর এমনভাবে বসান আছে যে, আমরা যেরূপ ইচ্ছা পা ঘুরাইতে পারি। এই অস্থিখানি যেখানে শেষ হইয়া পদদ্বয়ের নিম্নভাগের অস্থিগুলির সহিত মিলিয়াছে, তাহার নাম জানুসন্ধি (knee-joint) বা হাঁটু। জানুসন্ধির সম্মুখে যে ছোট অস্থি আছে, তাহার নাম জানুকাপালিক বা প্যাটেলা (patella) ; হাত দিয়া ঐখানে টিপিলে তাহা সহজেই অনুভব করা যায়।

জানুর নিম্নে দুইখানি করিয়া লম্বা লম্বা অস্থি দ্বারা পদদ্বয় গঠিত হইয়াছে ; একখানির নাম জঙ্ঘাস্থি বা টিবিয়া (tibia) এবং অন্যখানির নাম অনুজঙ্ঘাস্থি বা ফিবিউলা (fibula)। টিবিয়া অপেক্ষাকৃত মোটা ও শক্ত। জানুসন্ধির সঙ্গে টিবিয়া সংশ্লিষ্ট আছে, কিন্তু ফিবিউলা সে সন্ধির ভিতর যায় না। সেজন্য দাঁড়াইবার সময় দেহের সমুদয় ভার টিবিয়া অস্থির উপরই পড়ে। নীচের দিকে টিবিয়া ও ফিবিউলা গোড়ালি বা গুল্‌ফের সন্ধিস্থলে (ankle-joint) ছোট ছোট সাতখানি অস্থির সহিত মিলিয়াছে। পায়ের পাতায় ও আঙুলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি আছে।

সন্ধিস্থল।—দেহের ভিতর যেখানে দুইখানি অস্থির সংযোগ হইয়াছে, সেখানেই সন্ধিস্থল উৎপন্ন হইয়াছে। সন্ধিস্থলগুলি তিন প্রকারের।* কতকগুলিতে কোনদিকে নড়াচড়ার ব্যবস্থা নাই; করোটির অস্থিগুলি এই প্রকারের; এই অস্থিগুলি কেবল পরস্পরকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কতকগুলিতে সন্ধিস্থলে কব্জার ন্যায় কার্য হয়; কনুই, হাঁটু প্রভৃতি এই শ্রেণীর; এখানকার অস্থিগুলি সম্মুখে ও পশ্চাতে যাইতে ও আসিতে পারে, কিন্তু পার্শ্বে সরে না। আর কতকগুলি সন্ধিস্থল প্রায় সকল প্রকার প্রয়োজনীয় চালনার জন্যই নির্মিত হইয়াছে; সংলগ্ন অস্থিগুলি সব দিকেই ঘুরান ফিরান যায়; তাহাদিগকে কোটর (ball and socket) সন্ধি বলা হয়; কটি ও স্কন্ধের সন্ধি এই শ্রেণীর।

সন্ধিস্থল মাত্রেই সন্ধিবন্ধনী বা লিগামেণ্ট (ligament) নামক একপ্রকার শক্ত গ্রন্থি দ্বারা আবদ্ধ থাকে। গুরুতর আঘাতে এই গ্রন্থি ছিন্ন হইতে পারে। তখন দুইখানি অস্থি সন্ধিস্থল হইতে বিচ্যুত হইয়া (dislocation) তফাৎ হইয়া যায়, অথবা একখানি অন্যখানির উপরে উঠিয়া পড়ে।

(২) মাংসপেশী

দেহের অস্থিগুলির উপরে এবং গাত্রত্বকের নিম্নে যে কোমল পদার্থ আছে তাহাই মাংসপেশী বা মাস্‌ল (muscle)।

---

* 'স্কেলিটন' হইতে শিক্ষকেরা এগুলি বালকদের দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলে তাহারা সহজে বুঝিতে পারিবে।

মাছ বা মাংসের অ[illegible] যাহা খাইয়া থাকি তাহার প্রায় সবই মাংসপেশী। [illegible]নবদেহের মাংসপেশীগুলি দেখিতে লাল এবং সংখ্যায় পাঁচ শ[illegible]রেও অধিক। ছোট বড় ও নানাবিধ আকারের মাংসপেশী দেখা যায়। ইহাদের কোনটি দীর্ঘাকার, কোনটি বা গোলাকার। মাংসপেশীর প্রধান কার্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে চালনা করা। এই মাংসপেশীগুলির সাহায্যে আমরা চলিতে, ফিরিতে, দৌড়িতে, দাঁড়াইতে, ভার তুলিতে এবং অন্যান্য নানাবিধ কার্য করিতে সমর্থ হই। যদি কোন স্থানের মাংসপেশীগুলি অবশ হইয়া যায়, তখন সেস্থানের নড়াচড়া বন্ধ হইয়া যায়। মুখে আহার তোলার সময় হাতের মাংসপেশীগুলি প্রথমে খাদ্যদ্রব্য ধরিতে সাহায্য করে, পরে মুখব্যাদান

মাংসপেশী

করাও পেশীরই সাহায্যে সম্পন্ন হয়। মুখে আহার প্রবেশ করিলে কতকগুলি পেশীর দ্বারা তাহা চর্বণের সাহায্য হয় এবং চর্বিত খাদ্য পেশীর সাহায্যেই গলাধঃকৃত হয়। সেইরূপ হাঁটিবার সময়

প্রথমে কতকগুলি পেশী সঙ্কুচিত হইয়া অস্থিদ্বয়কে উত্তোলন করে এবং অন্যান্য পেশী শৃঙ্খলার সহিত পরস্পর কার্য করিয়া দেহকে চালাইয়া লইয়া যায়। যখন আমরা দাঁড়াইয়া থাকি, তখনও কতকগুলি পেশী সঙ্কুচিত হইয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে টানিয়া দাঁড় করাইয়া রাখে। এইরূপে দেহের যাবতীয় কার্যই পেশীর সহায়তায় সম্পন্ন হয়।

গঠন।—একখণ্ড মাংসের ভিতর ধীরে ধীরে ও সাবধানে আঙুল চালাইলে উহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। একটি পেশীর আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত বাহির করিতে পারিলে দেখিতে পাইবে, উহার মাঝখানটি মোটা ও মাংসবহুল এবং দুইটি প্রান্ত অস্থির সহিত সংলগ্ন। প্রান্তগুলিতে মাংসের পরিবর্তে চক্‌চকে সাদা ফিতার মতন পদার্থ দেখা যায়; তাহাকে টেণ্ডন (tendon) বলে।

সাধারণ গুণ।—মাংসপেশী টানিলে বা প্রসারিত করিলে বড় হয়; তারপর ছাড়িয়া দিলে স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ন্যায় আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কোন কারণে উত্তেজিত হইলেই উহারা সঙ্কুচিত হইয়া কঠিনভাব ধারণ করে।

শ্রেণী বিভাগ।—পেশীগুলি দুই প্রকারের, যথা—

(ক) ঐচ্ছিক পেশী।—এই প্রকার পেশীর কার্য আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সেগুলিকে সঙ্কুচিত করা যায় এবং এইরূপে সেগুলির দ্বারা বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদিত হইতে পারে।

আমাদের মনের সহিত মাংসপেশীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

দেখা গিয়াছে, কোন পেশীর বৃদ্ধি ও উন্নতিসাধনে যত্নবান হইয়া যদি নিবিষ্টমনে উহার সঙ্কোচন ও প্রসারণ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই উত্তম ফল পাওয়া যায়, কিন্তু মন সেদিকে না থাকিলে ফল ভাল হয় না। আজকাল বহু বাঙালী যুবক পেশীর কার্যক্ষমতা যে কতদূর বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তোমরা যদি পেশী নাচান (muscle dancing) দেখিয়া থাক তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, একাগ্রতার সহিত ব্যায়াম করিলে কি অদ্ভুত ফললাভ করা যায়। যদি নির্দিষ্ট পেশীর প্রতি মন নিবিষ্ট রাখিয়া উহার ব্যায়াম করা হয়, তাহা হইলে সাধারণ ব্যায়াম অপেক্ষা অনেক বেশি ফললাভ করা যায়। এইরূপে পেশীগুলিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায় এবং যখন যেদিকে ইচ্ছা তাহাদিগকে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায়।

(খ) **অনৈচ্ছিক পেশী**।—দেহের পেশীগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি আছে যাহাদের উপর আমাদের ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব নাই। ইহাদের ক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আমরা যাহাই করিতে চাহি না কেন, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইহারা নিজ নিজ কার্যে রত থাকে।

হৃৎপিণ্ডের পেশী এই শ্রেণীর। ইচ্ছা করিলেও আমরা উহার সঙ্কোচন বা প্রসারণ বন্ধ করিতে পারি না। আমরা নিদ্রিত হইলেও উহার কার্য চলিতে থাকে, এমন কি, আমাদের চৈতন্য লোপ হইলে কিংবা মনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেও ইহা সমানভাবে নিজ কার্য করিয়া যায়। তেমনি শ্বাসযন্ত্রাদির কতকগুলি পেশীর উপর আমাদের ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব নাই। পরিপাক

যন্ত্রাদিতে অবস্থিত পেশীগুলিও আমাদের ইচ্ছাশক্তির অধীন নহে। আমাদের ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন, ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে গিয়া পড়িলেই তাহা পরিপাক হইতে আরম্ভ হয়, এবং ক্রমে স্বাভাবিক নিয়মে তাহা জীর্ণ হইয়া যায় ও পরিত্যক্তাংশ মলদ্বারে চলিয়া যায়। রক্তবহা ধমনী ও শিরাগুলিতে যে পেশী আছে তাহাদের সহিতও আমাদের ইচ্ছাশক্তির সম্পর্ক নাই। আমাদের অজ্ঞাতসারে উহারা নিজ নিজ কার্য করিয়া যায়।

(৩) রক্তস্রোত ও হৃৎপিণ্ড

রক্ত।—আমাদের দেহের মধ্যে সর্বত্র যে লালবর্ণ তরল পদার্থের স্রোত বহিয়া যাইতেছে তাহারই নাম রক্ত। দেহের কোন স্থানের ধমনী (artery) কাটিয়া গেলে সেখান হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত নির্গত হয়, কিন্তু শিরা (vein) কাটিলে তাহা হইতে যে রক্ত বাহির হয় তাহার রঙ নীলাভ বা কাল্‌চে। যে দ্রব্যের জন্য রক্তের রং লাল হয় তাহার নাম হিমোগ্লোবিন (hœmoglobin)। কোন কোন রোগে ইহার পরিমাণ কম হইয়া যায় এবং তখন দেহ পাণ্ডুবর্ণ বা ফ্যাকাসে হয়।

রক্তের কার্য।—ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার পর উহার সারাংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। তখন রক্তের দ্বারা উহা দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়। উহা হইতে দেহের যে স্থানে যাহা আবশ্যক তাহা সরবরাহ হইয়া থাকে। ফুসফুসে যে অক্সিজেন প্রবেশ করে তাহাও রক্তস্রোতের সহিত দেহের সর্বত্র প্রেরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেহের সর্বত্র যে সকল দূষিত পদার্থ জমে,

সেগুলিও রক্তদ্বারা বাহিত হইয়া ক্রমে নির্গত শ্বাস-বায়ুর সঙ্গে অথবা মূত্র ও ঘর্মের সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। রক্তের সাহায্যেই লালা, পাকরস প্রভৃতি নানাপ্রকার রসের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দেহের উত্তাপও রক্ত সঞ্চালনের দ্বারাই রক্ষিত হয়।

রক্তের কণিকা।—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রক্তে লোহিত বর্ণের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা (red blood cell বা corpuscle) দৃষ্ট হয়। এগুলি গোলাকার অথচ চ্যাপটা। রক্তের তরল অংশে এই লোহিত কণিকাগুলি ভাসিয়া বেড়ায়। এগুলি এত ছোট যে এক ফোঁটা রক্তে লক্ষ লক্ষ কণিকা থাকিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর রক্তে এই কণিকাগুলির আকার ভিন্ন ভিন্ন রকম।

রক্তে লোহিত কণিকা ব্যতীত কতকগুলি শ্বেত কণিকাও আছে। শ্বেত কণিকাগুলি সংখ্যায় অনেক কম কিন্তু আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড় ও গোলাকার। সুস্থদেহে প্রতি ৫০০ বা ৬০০ লোহিত কণিকার সঙ্গে একটি বা দুইটি শ্বেত কণিকা থাকে। কিন্তু কোন কোন পীড়ায় এই শ্বেত কণিকার দল অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বাহিরের কোন সূক্ষ্ম কঠিন কণা রক্তে প্রবেশ করিলে এই শ্বেত কণিকাগুলি সেগুলিকে নষ্ট করে বা খাইয়া ফেলে।

আমাদের দেহে রোগ-প্রতিরোধের যে ক্ষমতা আছে তাহা এই সকল শ্বেত কণিকার উপরই প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করে। দেহে কোনরূপ জীবাণু প্রবেশ করিলে শ্বেত কণিকাগুলি তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে এবং প্রায়শ তাহাতে

সক্ষম হইয়া আমাদিগকে অনেক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করে। সেজন্য ইহাদিগকে আমাদের "শরীর রক্ষক" বলা হয়। ইহাদের সংখ্যা কম হইলে বা ইহারা দুর্বল হইলে, জীবাণুর সহিত যুদ্ধে ইহারা হারিয়া যায় এবং তখন আমাদের দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

রক্তস্রোতের যন্ত্রাদি বলিতে হৃৎপিণ্ড, ধমনী, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তনালীর জাল (capillaries) এবং শিরাগুলি বুঝায়।
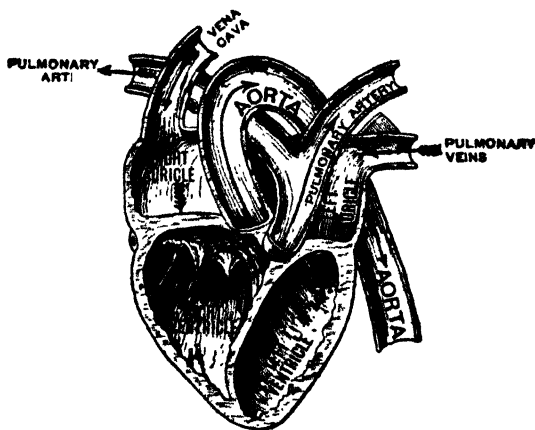
হৃৎপিণ্ড

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ড আমাদের শরীরের একটি শ্রেষ্ঠ ও অত্যাবশ্যক যন্ত্র। উহা বক্ষঃস্থলের ভিতর অবস্থিত। বুকের বামদিকে হাতের তালু চাপিয়া ধরিলে ভিতরে যে ধুক্ ধুক্ শব্দ টের পাওয়া যায়, তাহা এই হৃৎপিণ্ড হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহা মাংসপেশী দ্বারা নির্মিত। ইহাতে চারিটি

গহ্বর বা কুঠরি আছে, এবং দেখিতে ইহা একটি থলির মত। চারিটি গহ্বরের মধ্যে উপরের দুইটিকে অলিন্দ বা অরিকেল (auricle) এবং নীচের দুইটিকে নিলয় বা ভেন্‌ট্রি-কেল (ventricle) বলা হয়। এই গহ্বরগুলির মাঝে মাঝে দরজার ব্যবস্থা আছে; ঐ দরজাগুলিকে কপাটক বা ভাল্‌ব্‌ (valve) বলে। এই দরজাগুলি একবার খোলে এবং পরক্ষণেই বন্ধ হইয়া যায়। দরজাগুলি এরূপ কৌশলে নির্মিত যে রক্ত অরিকেল হইতে ভেনট্রিকেলে পড়ে, কিন্তু ভেনট্রিকেল হইতে অরিকেলে যাইতে পারে না। এই দরজাগুলি ছিন্ন বা ভগ্ন হইলে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবার ব্যাঘাত হয়।

জীবনের সূচনা হইতেই হৃৎপিণ্ডের কার্য আরম্ভ হয় এবং আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে তাহা বন্ধ হয়। ইহার এই কার্য দ্বারা রক্তের স্রোত সদা সর্বদা আমাদের দেহের ভিতর সর্বত্র সঞ্চালিত হয়। আমরা ইচ্ছা করিয়া ইহার কার্যের কোনপ্রকার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। জীবনের অবসানে ইহার কার্য বন্ধ হইয়া যায়, অথবা ইহার কার্য বন্ধ হইলে জীবনের অবসান হয়।

হৃৎপিণ্ডের কার্যপ্রণালী কতকটা পাম্পের মত। ইহা সমস্ত দেহে বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক হইতে দূষিত রক্ত টানিয়া লইয়া যায়। এই দূষিত রক্ত ফুসফুসের ভিতর প্রেরিত হয় এবং সেখানে বিশুদ্ধ হয়। এই কার্যের জন্য হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার ঐ ধুক্‌ধুক্‌ শব্দ হয়। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অংশ দূষিত রক্ত টানিয়া লয় এবং বাম অংশের

সঙ্কোচনে যে চাপ উৎপন্ন হয় তাহাতে বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালিত হয়। ছবিখানিতে রক্ত কোন্ পথে যায় তাহা তীর দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড সাধারণত প্রতি মিনিটে ৭২ হইতে ৮০ বার স্পন্দিত হয়। হাতের নাড়ী অনুভব করিয়া তাহা গোনা যায়। পরিশ্রম করিলে বা ব্যায়ামকালে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। পীড়িত অবস্থায় এবং জ্বর হইলে উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যা বাড়িয়া যায়।

ধমনী ও শিরা।—হৃৎপিণ্ড হইতে মহাধমনী বা অ্যাওর্টা (aorta) নামক বৃহৎ ধমনী বাহির হইয়াছে। ইহা হইতে আবার ক্রমে বহু শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া জালের মত দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইগুলির ভিতর দিয়াই বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে স্রোতের আকারে বহিয়া যায়। ক্রমে এইগুলি এত সূক্ষ্ম হইয়া যায় যে, চক্ষুদ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় না; এই সূক্ষ্ম রক্তবহা নালীগুলিকে জালক বা ক্যাপিলারিস (capillaries) বলে। এগুলি এত ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া সমস্ত দেহকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে যে, একটি সূচ ফুটাইলে কোন না কোন ক্যাপিলারির গায়ে গিয়া লাগে এবং উহা ছিন্ন হইয়া রক্ত বাহির হয়।

পূর্বেই আমরা বলিয়াছি, বিশুদ্ধ রক্ত দেহে প্রবাহিত হইয়া আবার দূষিত হইয়া পড়ে। তখন সেই দূষিত রক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালীর ভিতর দিয়া ক্রমে অপেক্ষাকৃত বড় নলের মধ্যে যাইয়া পড়ে। এই নলগুলিই শিরা। ছোট ছোট

শিরাগুলি ক্রমে সংযুক্ত হইয়া বড় বড় শিরায় পরিণত হয় এবং উহাদের ভিতর দিয়া দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। পরে হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে উহা ফুসফুসের ভিতর প্রেরিত হয় এবং সেখানে সংশোধিত হইয়া পুনরায় দেহের সর্বত্র প্রেরিত হয়। এইরূপে রক্তস্রোত আমাদের দেহের মধ্যে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে।

(৪) শ্বাসযন্ত্রাদি

শ্বাসযন্ত্রাদি বলিলে ফ্যারিংক্স (pharynx), শ্বাসনলী এবং ফুসফুস (lungs) বুঝায়। শ্বাসবায়ু নাসিকা কিংবা মুখের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া ফ্যারিংক্সের ভিতর দিয়া শ্বাসনলীতে যায়, এবং সেখান হইতে ফুসফুসের ভিতর গিয়া পড়ে।
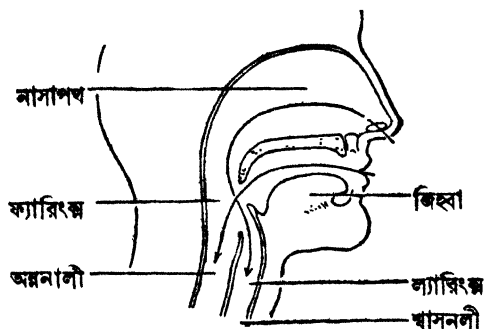
নাসাপথ।—নাক ও মুখের ভিতর দিয়া আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু যাওয়া-আসা করে; কিন্তু মুখ দিয়া তাহা টানা উচিত নহে। নাসিকাই শ্বাসগ্রহণের জন্য নির্মিত হইয়াছে এবং উহার

গঠনও তাহার উপযোগী। উহার ভিতরের বিশেষ আবরণে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবাহী নালী আছে। নাসিকার ভিতর কতকগুলি লোম আছে। নাসিকার ভিতর বায়ু প্রবেশ করিলেই তাহার শৈত্য কমিয়া যায় এবং বায়ুর যে ময়লা ঐ লোমাবলীতে আটকাইয়া যায় তাহা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। নাসাপথের প্রাচীরে অস্থিগুলি এমন ভাবে সাজান যে, এই পরিমিত পরিসরের ভিতর অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া পূর্বোক্ত আবরণ বিস্তৃত রহিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু রক্তবাহী নালীর স্থান সংকুলান হইয়াছে।

ফ্যারিংক্স।—গলদেশে যেখানে শ্বাসনলী ও অন্ননালী সংযুক্ত হইয়াছে তাহার নাম ফ্যারিংক্স। নাসিকার পশ্চাৎ রন্ধ্র দুইটিও ঐখানে অবস্থিত এবং ক্ষুদ্র নলের দ্বারা উভয় কর্ণের সহিত এই স্থান সংযুক্ত। ভুক্তদ্রব্য ও শ্বাসবায়ু ঐ এক পথে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে চলিয়া যায়। এই সন্ধিস্থলে এপিগ্লটিস (epiglottis) বা আলজিহ্বা নামক একটি পর্দা অতীব কৌশলের সহিত স্থাপিত হওয়ায় ভুক্তদ্রব্য শ্বাসনলীর ভিতর গিয়া পড়ে না। খাদ্যাদি গলাধঃকরণের সময় এপিগ্লটিস শ্বাসনলীর মুখ আবৃত করিয়া এমন ভাবে রক্ষা করে যে, উহার উপর দিয়া খাদ্য ও পানীয় অন্ননালীর ভিতর গিয়া পড়ে, কিন্তু শ্বাসনলীতে যাইতে পারে না।

ফ্যারিংক্সের দুইধারে কুলের আঁটির মত দুইটি টন্‌সিল (tonsil) অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন উপর হইতে ক্ষুদ্র জিহ্বার মত যাহা ঝুলিয়া আছে তাহাকে 'আলজিহ্বা' বা ইউভিউলা (uvula) বলে।

শ্বাসনলী।—শ্বাসনলীর ঊর্ধ্বাংশের নাম. ল্যারিংক্স (larynx)। উহার ভিতর আমাদের স্বর উৎপন্ন করিবার যন্ত্রাদি অবস্থিত আছে। স্বরতন্ত্রী বা ভোকাল কর্ড (vocal cords) নামক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পনশীল পেশীগুলি ঐ ল্যারিংক্সের ভিতরে এমনভাবে লাগান আছে যে, বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে সেগুলি বাজিয়া উঠে এবং তাহা হইতেই স্বরের সৃষ্টি হয়। পরে সেই স্বর নানাপ্রকারে অন্যান্য যন্ত্রাদি দ্বারা পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া আমাদের বাক্যে প্রকাশ পায়।

শ্বাসনলীর নিম্নভাগের নাম ট্রকিয়া (trachea)। উহা নীচের দিকে দ্বিধা বিভক্তি হইয়া ব্রন্‌কস (bronchus) আকারে দুই ধারের ফুসফুসে প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে ইহা আবার ক্রমান্বয়ে নানা অংশে বিভক্ত হইয়া ফুসফুসের ভিতর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

ফুসফুস।—ব্রন্‌কস হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া ফুসফুসের ভিতর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, উহারা অবশেষে বায়ুকোষে পরিণত হইয়াছে। ফুসফুস এরূপ অসখ্য বায়ুকোষের সমষ্টি মাত্র। কতকগুলি বায়ুকোষ লইয়া এক একটি গুচ্ছ হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক গুচ্ছ দ্বারা ফুসফুস গঠিত হইয়াছে। উহা কতকটা স্পঞ্জের মত। শ্বাসযন্ত্রাদির
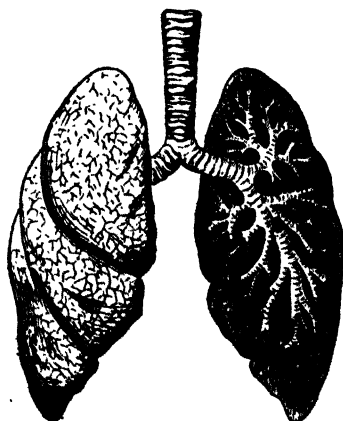
ব্রনকস ও ফুসফুস

মধ্যে ফুসফুসই প্রধান। উহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বক্ষঃ-স্থলের বামে ও দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার ভিতরের নলগুলির ছিদ্রের ভিতর দিয়া বায়ুকোষগুলিতে বায়ু প্রবেশ করে। এই সকল বায়ুকোষের গাত্রে অসংখ্য রক্তের নালী আছে এবং সেগুলিতে অনবরত রক্তস্রোত বহিতেছে।

শ্বাসপ্রশ্বাস।—নাক ও মুখের ভিতর দিয়া যে বায়ু প্রবেশ ও নির্গত হইতে থাকে তাহারই নাম শ্বাসপ্রশ্বাস। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরই কাঁদিয়া উঠে, এবং সেই সঙ্গে বাহিরের বায়ু প্রথম তাহার শরীরের ভিতর যাতায়াত করিতে থাকে। একবার আরম্ভ হইলে ইহা জীবনের শেষ পর্যন্ত চলিয়া থাকে এবং কোন কারণে বন্ধ হইলে অবিলম্বে মৃত্যু হয়।

আমাদের বক্ষঃস্থল এরূপ ভাবে গঠিত যে তাহা ক্রমান্বয়ে একবার স্ফীত ও পরক্ষণে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে বাহিরের বায়ু বক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাহির হইয়া আসে। সেজন্য উহাকে হাপরের সহিত তুলনা করা যায়। হাপর প্রসারিত করিলে তাহাতে বায়ু প্রবেশ করে, তারপর যেমন উহাতে চাপ দেওয়া হয় অমনি বায়ু বাহির হইয়া যায়। তেমনি বক্ষঃস্থলও প্রসারিত হইলে বাহিরের বায়ু তাহাতে প্রবেশ করে এবং পরক্ষণেই বক্ষ সঙ্কুচিত হইয়া সেই বায়ু বাহির করিয়া দেয়। বক্ষঃস্থলের এই প্রসারণ ও সঙ্কোচন হইতেই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস চলিতেছে। ইহা অতি সহজে সম্পাদিত হয়। সেজন্য রাতদিন শ্বাস লইয়াও আমরা কষ্ট অনুভব করি না।

শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়াকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়

যথা—(১) প্রথমে বায়ু বক্ষের ভিতর টানিয়া লওয়া বা শ্বাস গ্রহণ করা হয় ; (২) ইহার পরেই ক্ষণিক স্তব্ধতা দেখা যায় ; (৩) পরে ভিতরের বায়ু বাহির হইয়া আসে বা নিশ্বাস ফেলা হয় ; এবং (৪) কিছুক্ষণের জন্য বিরাম হয়। সুস্থ অবস্থায় আমাদের প্রতি মিনিটে প্রায় ১৮।২০ বার শ্বাসক্রিয়া হয়। অবস্থাভেদে ইহার কম বেশি হইয়া থাকে।

উদর ও ডায়াফ্রামের বিভিন্ন অবস্থা

১ম চিত্র—শ্বাস টানার সময়   ২য় চিত্র—শ্বাস ফেলার সময়
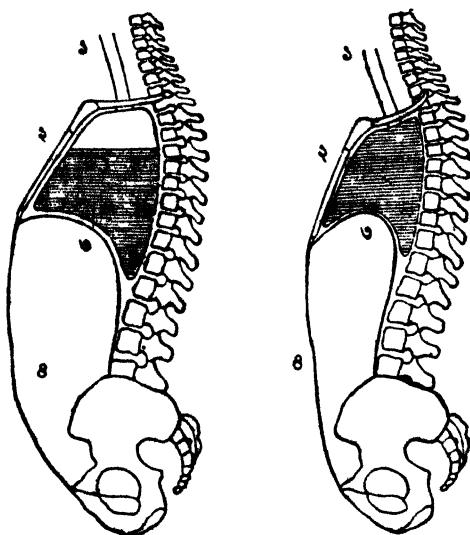
১। শ্বাসনলী ২। বক্ষের অস্থি ৩। ডায়াফ্রাম ৪। উদর

শ্বাসক্রিয়ার সহায়ক।—আমাদের গলদেশের, বক্ষের ও উদরের মাংসপেশীগুলিও শ্বাসগ্রহণ কার্যে যথেষ্ট সহায়তা

করে। সর্ব্বাপেক্ষা ডায়াফ্রাম নামক মাংসপেশীর সাহায্যই প্রধান। উহা দেখিতে কতকটা পাখার মত এবং বক্ষঃস্থলের নিম্নে ও উদরের ঠিক উপরে উহা অবস্থিত। উহার দুইটি চিত্র পূর্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। শ্বাস টানার ফলে বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিলে ডায়াফ্রামের আয়তন কিরূপ হয় তাহা প্রথম চিত্রে দেখান হইয়াছে, এবং পরক্ষণে মাংসপেশীর চাপে ফুসফুসের বায়ু বাহির হইবার কালে ডায়াফ্রামের আয়তন কিরূপ হয় তাহা দ্বিতীয় চিত্রে দেখান হইয়াছে। শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার সময় যখন বায়ু ফুসফুসের ভিতর প্রবেশ করে বা তাহা হইতে নির্গত হইয়া যায়, তখন ডায়াফ্রাম বক্ষঃস্থলের আয়তন বৃদ্ধি এবং সঙ্কোচনে যথেষ্ট সহায়তা করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ডায়াফ্রাম সবল থাকিলে শ্বাসকার্যের বিশেষ সুবিধা হয়। চেষ্টা করিয়া ইহার কার্যতৎপরতা ও ক্ষমতা বাড়ানও যায়। ইহার জন্য এবং বক্ষঃস্থলের পেশীগুলির বল বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সকল ব্যায়ামের প্রচলন আছে সেগুলি পালনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ফুসফুসের ক্রিয়া।—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যে শ্বাসনলীর ভিতর দিয়া বায়ু প্রবেশ করে তাহা ক্রমাগত বিভক্ত হইতে হইতে শেষে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষে পরিণত হইয়াছে। এই বায়ুকোষের সমষ্টি লইয়াই ফুসফুস গঠিত। এগুলি অতীব ক্ষুদ্র এবং বড় করিয়া দেখাইলে কতকটা আঙুরের গুচ্ছের মত দেখায়। পরপৃষ্ঠার চিত্রে ইহাদের বর্ধিত আকার দেখান হইয়াছে। এই সকল বায়ুকোষের মধ্যেই

শ্বাসবায়ু প্রবেশ করে। ইহাদের গাত্রে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী সংযুক্ত আছে। তাহাদের ভিতর দিয়া সমস্ত দেহ হইতে দূষিত রক্ত আসিয়া পড়ে ও বহিয়া যায়। ইহার ফলে ফুসফুসের ভিতর বায়ু ও রক্তের মিশ্রণ হয়; অর্থাৎ বায়ু হইতে অক্সিজেন রক্তে যায় এবং রক্ত হইতে কার্বনিক অ্যাসিড প্রভৃতি দূষিত দ্রব্য বায়ুতে যাইয়া মিশে। তখন ফুসফুস হইতে রক্ত পরিশোধিত হইয়া হৃৎপিণ্ডে চলিয়া যায় এবং অবশেষে উহা দেহের সর্বত্র পরিচালিত হয়। এই বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হইবার সময় সর্বত্র প্রয়োজনীয় অক্সিজেন প্রদান করে; কিন্তু শীঘ্রই ইহা পুনরায় দূষিত হইয়া পড়ে এবং কালচে (নীলাভ) বর্ণ ধারণ করে। এই কালচে দূষিত রক্ত আবার ফুসফুসে যাইয়া পুনরায় বিশুদ্ধ হয় এবং টকটকে লালবর্ণ ধারণ করে।
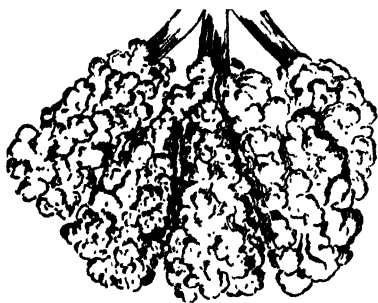
বায়ুকোষ

আদান প্রদানের ফল।—ফুসফুসের বায়ুকোষের ভিতর বায়ু ও রক্তের মধ্যে পূর্বোক্ত আদান প্রদানের ফলে পরিত্যক্ত শ্বাসবায়ুতে শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ অক্সিজেন কমিয়া যায় ও কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের পরিমাণ বেশি হয়। দেখা গিয়াছে যে, পরিত্যক্ত শ্বাসবায়ুতে কার্বনিক অ্যাসিড প্রায় শতগুণ

বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন অবস্থায় উহার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। পীড়াকালে শরীরে দহন ক্রিয়া অধিক হওয়ায় কার্বনিক অ্যাসিড অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হয়।

পরিত্যক্ত শ্বাসবায়ুর সহিত কিয়ৎ পরিমাণ জলীয় বাষ্পও দেহ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। সেজন্য ঐ বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। স্বচ্ছ আয়নায় হাই ছাড়িলে যে জলকণা উৎপন্ন হয়, ইহা তাহার প্রমাণ। আমোনিয়া প্রভৃতি গ্যাস ও জৈব পদার্থও সামান্য পরিমাণে ঐ বায়ুর সহিত বাহির হইয়া আসে। তদ্ব্যতীত রক্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে উত্তাপ বাহির হইয়া পরিত্যক্ত নিশ্বাস বায়ুকে গরম করে।

(৫) পরিপাক যন্ত্র

খাদ্যবস্তু উদরস্থ হইলে পরিপাক যন্ত্রাদির সহায়তায় উহা বিশেষরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই পরিবর্তনের ফলে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা ক্রমে রক্তে মিশিয়া দেহের সর্বত্র বাহিত হইয়া উহার পুষ্টি সাধন করে। পরিপাক না হইলে খাদ্য হইতে দেহের কোন উপকার হয় না। কিরূপে খাদ্যদ্রব্য শরীরের ভিতর পরিবর্তিত হইয়া উহার গঠন ও রক্ষায় সহায়তা করে তাহা জানা উচিত। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। *

মুখ, দন্ত, জিহ্বা, লালাগ্রন্থি, তালু, আলজিহ্বা, অন্ননালী,

* পরিপাক ক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইলেও প্রয়োজনীয় বোধে কতকগুলি কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেগুলি বালকদের পক্ষে প্রথমে অনুপযোগী বিবেচিত হইলে শিক্ষকেরা বাদ দিতে পারেন।

পাকস্থলী, অন্ত্র, ক্লোম (pancreas) এবং যকৃৎ বা লিভার (liver) ইত্যাদি লইয়া পরিপাক যন্ত্র গঠিত হইয়াছে। মুখ হইতে মলদ্বার অবধি বিস্তৃত নালীকে পৌষ্টিক নালী (alimentary canal) বলা হয়, কারণ এই পথে ভুক্ত দ্রব্যাদি চালিত হইয়া দেহের পুষ্টিবিধান করে।

মুখ।—দেহের ভিতর খাদ্যদ্রব্য প্রবেশের দ্বারই মুখ। ইহার মধ্যে দন্ত, জিহ্বা ও লালাগ্রন্থি আছে। খাদ্যদ্রব্য মুখের ভিতর যাইলেই দন্তের দ্বারা তাহা চর্বণ করা হয় এবং জিহ্বা উহাকে নাড়াচাড়া করিয়া দন্তের সাহায্য করে। সঙ্গে সঙ্গে লালাগ্রন্থিগুলি হইতে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে এবং জিহ্বার সাহায্যে উহা খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। খাদ্যদ্রব্যগুলি এইরূপে চর্বিত ও লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া মুখবিবরের পেশীর চাপে গলার দিকে প্রেরিত হয়।

দন্ত।—শিশুর সাত আট মাস বয়সে প্রথম দাঁত উঠে; ক্রমে কুড়িটি দাঁত হয়; সেগুলি কিন্তু স্থায়ী হয় না। উহাদিগকে "দুধে দাঁত" (milk teeth) বলে; সাত বৎসর বয়স হইলে সেগুলি পড়িয়া যাইতে আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় বার যে দাঁতগুলি বহির্গত হয় তাহাদিগকে "স্থায়ী দন্ত" (permanent teeth) বলে; এগুলি সংখ্যায় মোট বত্রিশটি। সব দাঁতগুলি বাহির হইতে কিছুকাল সময় লাগে। উভয় মাড়ির দুই প্রান্তের শেষ চারিটি "জ্ঞান দন্ত" বা "আক্কেল দাঁত" ২২।২৩ বৎসর বয়সে বাহির হয় এবং কখনও বা আরও বেশি বয়সেও উদ্গত হয়। বত্রিশটি

দাঁতের মধ্যে মাঝের আটটি কৃন্তক (incisors) দন্ত; এগুলি ধারাল এবং ছেদন কার্যের উপযোগী। তারপর চারিটি ছেদক (canine) দন্ত আছে; এগুলি দেখিতে সরু, কিন্তু ইহাদের অগ্রভাগ ধারাল নহে; মাংসাদি ছিন্ন করিতে ইহাদিগকে কাজে লাগে। তারপর আটটি দ্বিমুখ বা দ্ব্যগ্র দন্ত (bicuspids); এবং সর্বশেষে বারটি পেষক দন্ত (molars) আছে। প্রথম কয়েকটির দ্বারা খাদ্যের কর্তন ও ছেদন এবং শেষগুলির দ্বারা পেষণ ও চর্বণ সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য ছেদন ও চর্বণ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করাই দন্তের প্রধান কার্য। এইরূপে বিভক্ত হইলে ভুক্তদ্রব্যের মধ্যে পাকরস সহজে প্রবেশ করিয়া উহা জীর্ণ করিতে পারে। পরিপাক ক্রিয়ায় দন্তের কার্য বিশেষ আবশ্যক, কারণ খাদ্যদ্রব্য সম্যক্ চর্বিত না হইলে পরিপাকে ব্যাঘাত হয়।

দন্তের গঠন
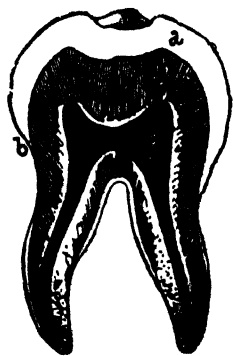
(a) এনামেল, (b) ডেন্‌টিন,
(c) দন্তগহ্বর

দন্তগুলি ডেন্‌টিন (dentine) নামক কঠিন পদার্থে নির্মিত এবং উহাদের বহির্ভাগ এনামেল (enamel) নামক অতি কঠিন পদার্থে আবৃত থাকে। এই এনামেলের মত কঠিন পদার্থ দেহে আর কিছু নাই। দন্তমূলের অভ্যন্তরে কোমল মাজ আছে; তাহাতে রক্তবহা নালী ও নার্ভ-তন্তু আছে; এজন্য দাঁতের পোষণের কোন

অভাব হয় না। দাঁতের পীড়া জন্মিলে ইহার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

জিহ্বা।—কতকগুলি মাংসপেশী লইয়া জিহ্বা গঠিত হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য চর্বণকালে জিহ্বার সঞ্চালনে খাদ্যদ্রব্য মুখের ভিতর আলোড়িত হইয়া লালার সহিত মিশ্রিত হয় এবং গলার দিকে চালিত হয়। জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুন্নত (কাঁটা কাঁটা) প্যাপিলি (papillœ) আছে। এগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসগ্রন্থি থাকে এবং ইহারাই মধুর, তিক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন আস্বাদ গ্রহণের ইন্দ্রিয়। এইজন্য খাদ্যদ্রব্য জিহ্বায় ঠেকিলে আমরা উহার আস্বাদ পাই। এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে খাদ্য ও অখাদ্যের বিচার করা যাইত না।

লালাগ্রন্থি।—মুখবিবরে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লালাগ্রন্থি (salivary glands) আছে। খাদ্যদ্রব্য চর্বণকালে সেগুলি হইতে মুখের ভিতর লালা নিঃসৃত হয়। উহার বড় বড়গুলি যোয়ালের উপর ও নিম্নে, জিহ্বার তলদেশে এবং চিবুকের নিকট অবস্থিত। 'মিউকাস' নিঃসারক বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থি দ্বারাও মুখবিবর সমাকীর্ণ। লালায় টায়ালিন (ptyalin) নামক একপ্রকার পদার্থ থাকে, উহা দ্বারা শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হয়। এইরূপে শর্করায় পরিণত না হইলে শ্বেতসার খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হয় না। অতএব পরিপাক ক্রিয়ার জন্য লালা অতীব প্রয়োজনীয়। এতদ্ভিন্ন লালা খাদ্যদ্রব্যকে গলাইয়া দেয় এবং মুখবিবর সিক্ত রাখিয়া ও খাদ্যদ্রব্যকে পিচ্ছিল করিয়া উহার গলাধঃকরণ সহজ করিয়া দেয়।

যাহারা শ্বেতসার দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করে তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, উহা ভাল করিয়া জীর্ণ করিতে লালার সম্যক্ সাহায্য লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অতএব অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আহার করা অন্যায়। স্কুলে বা অফিসে যাইবার সময় পাঁচ মিনিটের মধ্যে আহার শেষ করার অভ্যাস অতীব দূষণীয়।

লালাগ্রন্থিসমূহ

উহাতে লালার সহিত খাদ্য ভাল করিয়া মিশিবার সময় পায় না এবং সেজন্য ভাল পরিপাক হয় না। উহার ফলে পরিণামে অজীর্ণরোগ উৎপন্ন হয়।

তালু, আলজিহ্বা।—মুখগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগকে তালুদেশ বলে। ফ্যারিংক্স বলিলেও প্রায় ঐস্থানটি বুঝায়। ভুক্তদ্রব্য ও শ্বাসবায়ু ঐ একপথে প্রবেশ করিলেও নিজ নিজ গন্তব্যপথে যায়। ভুক্তদ্রব্য মুখের ভিতর পিণ্ডাকারে পরিণত হইলে, সেখানকার মাংসপেশীর চাপে গলার ভিতর দিয়া নীচে নামিয়া যায়। সেখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে রস নিঃসৃত হইয়া ঐ খাদ্যপিণ্ডকে অধিকতর পিচ্ছিল করিয়া সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করিবার সহায়তা করে। যাইবার পথে খাদ্যকে শ্বাসনালীর মুখ অতিক্রম করিতে হয়। সেজন্য শ্বাসনালীর উপর আলজিহ্বা নামক ঢাক্‌নার বন্দোবস্ত আছে। যখন খাদ্য

উপর দিয়া যায় তখন ঐ ঢাক্‌না শ্বাসনালীর পথ বন্ধ করিয়া দেয়। যদি অসাবধানে একটুকু খাদ্যও শ্বাসপথে যাইয়া পড়ে তখনই "বিষম" লাগে। (১৮ পৃষ্ঠার ছবি দেখ)

অন্ননালী।—খাদ্যদ্রব্য গিলিবার পর উহা একটি নলের ভিতর দিয়া পাকস্থলীতে যাইয়া পড়ে। এই নলের নাম ইসোফেগস্ (esophagus) বা অন্ননালী। ইহা মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা লম্বায় প্রায় ১০ ইঞ্চি এবং শ্বাসনলীর ঠিক পিছনে অবস্থিত। খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিলে এই নলের ভিতর দিয়া মাংসপেশীর সঙ্কোচনে তাহা ধীরে ধীরে নিম্নে পাকস্থলীতে চলিয়া যায়।

পাকস্থলী।—পৌষ্টিক নালী (alimentary canal) পথে যে বিস্তৃত থলির ন্যায় অংশে ভুক্তদ্রব্যাদি যাইয়া পড়ে, তাহাকে পাকস্থলী (stomach) বলে। ইহাই পাকযন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত অংশ ও প্রধান স্থান। ইহার আকার ভিস্তির মশকের মত। ইহার এক মুখ দিয়া ভুক্তদ্রব্য প্রবেশ করে এবং অন্য মুখ দিয়া গ্রহণী-নালীতে চলিয়া যায়, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য সব খাদ্যদ্রব্যকে এখানে থাকিতে হয়। পাকস্থলীর দৈর্ঘ্য ১০।১২ ইঞ্চি এবং গভীরতা প্রায় ৪ ইঞ্চি। খাদ্যে পরিপূর্ণ হইলে ইহা প্রায় ১ ফুট ৫ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হইতে পারে। এইখানে ভুক্তদ্রব্য কিছু-কাল থাকে এবং তখন উহাতে কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

পাকস্থলীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু পেপ্‌টিক (peptic) গ্রন্থির সমাবেশ আছে; এগুলি হইতে যে রস বাহির হয় তাহাকে পাকরস
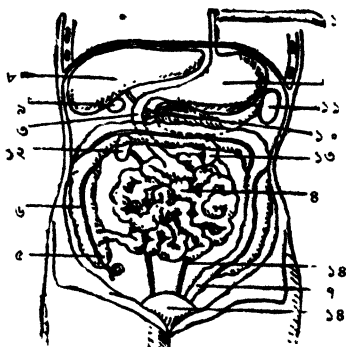
১। অন্ননালী ২। পাকস্থলী ৩। গ্রহণীনালী এবং উহার অভ্যন্তরস্থ পিত্তনালী ও প্যানক্রিয়েটিক বা ক্লোমনালী ৪। ক্ষুদ্র অন্ত্র ৫। বৃহৎ অন্ত্রের সংশ্লিষ্ট কৃমি আকৃতি নালী ৬। কোলন বা বৃহৎ অন্ত্র ৭। রেক্টম বা পায়ুমার্গ ৮। যকৃৎ ৯। পিত্তকোষ ১০। প্যানক্রিয়াস বা ক্লোম ১১। প্লীহা ১২ ও ১৩। দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বস্থ মূত্রগ্রন্থি বা বৃক্ক ১৪। মূত্রাশয় এবং উহার ঊর্ধ্বভাগে অনুপ্রবিষ্ট দুইটি মূত্রনালীর মুখ।

(gastric juice) বলে। এই পাকরসের প্রধান উপাদান হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (hydrochloric acid) এবং পেপ্‌সিন (pepsin) ও রেনিন (rennin) নামক কিণ্ব পদার্থ। সাধারণত এই রসে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হয়। পাকস্থলীর মাংসপেশীগুলি উহাদের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ক্রিয়া দ্বারা ভুক্তদ্রব্য আলোড়িত করিয়া এই পাকরসের সহিত মিশাইয়া দেয়। মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, ডাল, কলাই প্রভৃতি নাইট্রোজেন-বিশিষ্ট দ্রব্যাদি এই পাকরসে জীর্ণ হয়। কিন্তু শ্বেতসারের পরিপাকে উহা সহায়তা করে না। পাকস্থলীতে ভুক্তদ্রব্য পরিশোষণের উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যে অম্লাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে “কাইম” (chyme) বলে। ইহাতে অবস্থিত পেপটোন, লবণ ও শর্করা ইত্যাদি পদার্থ কতকটা পাকস্থলী হইতে ও কতকটা অন্ত্রের ভিতর হইতে রক্তস্রোতে পরিশোষিত হয়। পাকস্থলীর পেষণে খাদ্যমণ্ড ক্রমে ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে যাইয়া পড়ে।

অন্ত্র।—অন্ত্র প্রধানত দুই অংশে বিভক্ত; প্রথম অংশের নাম ক্ষুদ্র অন্ত্র (small intestine) এবং দ্বিতীয় অংশের নাম বৃহৎ অন্ত্র (large intestine)। ক্ষুদ্র অন্ত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ ফুট এবং বৃহৎ অন্ত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫।৬ ফুট। অন্ত্রগুলি উদর-গহ্বরে কুণ্ডলিতভাবে অবস্থিত। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অন্ত্রের গাত্রে যে সকল মাংসপেশী আছে, সেগুলি ভুক্তদ্রব্যের উপর ক্রমাগত সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা উহাকে পায়ুমার্গের দিকে ঠেলিয়া দেয়।

ক্ষুদ্র অন্ত্র।—ক্ষুদ্র অন্ত্রের গাত্রে ভিলাই (villi) নামক কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উন্নত অংশ আছে। রক্তবাহী নালী ও রসবাহী স্রোত উহাদের অভ্যন্তরে আছে। (পরপৃষ্ঠার ছবি দেখ) উহারা পরিপক্ক খাদ্যের রসের পরিশোষণে সাহায্য করে। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র অন্ত্রের গাত্রে অবস্থিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে আন্ত্রিক রস নিঃসৃত হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। ভিলাইগুলির মধ্যস্থিত রসবাহী স্রোতগুলিকে ল্যাক্‌টিল (lacteal) বলে। ইহাদের মধ্যে যখন খাদ্য-রস পরিশোষিত হইয়া অবস্থিতি করে তখন তাহাকে "কাইল" (chyle) নামে অভিহিত করা হয়। কাইল দেখিতে দুগ্ধের ন্যায়।

ক্ষুদ্র অন্ত্রটি তিন অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমাংশের নাম ডুওডিনম (duodenum) বা গ্রহণী-নালী। ইহা পাকস্থলীর অব্যবহিত পরেই অবস্থিত এবং ইহা প্রায় ১৩ ইঞ্চি লম্বা। গ্রহণী-নালীর গাত্রে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। সেগুলি হইতে লালার মত রস নিঃসৃত হয়। মুখের লালারসে শর্করায় পরিণত না হইয়া যে অপক্ক শ্বেতসার পাকস্থলীতে যাইয়া

পড়ে এবং সেখানেও অপরিণত অবস্থায় থাকে, তাহা শেষে গ্রহণী-নালীতে আসিয়া সেখানকার রসে পরিপক্ক হয়। ফলত গ্রহণী-নালী পরিপাক যন্ত্রের একটি প্রধান অংশ। ক্ষুদ্র অন্ত্রের এই অংশেই যকৃৎ হইতে পিত্তরস এবং ক্লোমযন্ত্র হইতে উহার রস আসিয়া পড়ে। গ্রহণী-নালীর নীচে ক্ষুদ্র অন্ত্রের অপর দুই অংশের নাম জেজুনম (jejunum) এবং ইলিয়ম (ileum)। জেজুনম দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮।৯ ফুট এবং ইলিয়ম ১০।১১ ফুট হয়।

ভিলাইদ্বয়

(স্বাভাবিক আয়তন অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া আঁকা)
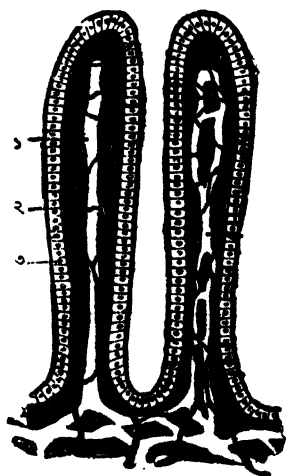
১। ল্যাক্‌টিল
২। রক্তনালী
৩। উপরের আবরণ

বৃহৎ অন্ত্র -ভুক্তদ্রব্যের কতক অংশ পরিশোষিত না হইয়া অবশিষ্ট থাকে এবং ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে বৃহৎ অন্ত্রে যাইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রের সন্ধিস্থলে ইলিও-সিকাল্ ভাল্‌ব্ (illeo-cecal valve) নামক একটি আবরণ আছে। এই আবরণ এমন কৌশলে স্থাপিত যে, যখন ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে কোন দ্রব্য বৃহৎ অন্ত্রে প্রবেশ করে তখন উহা উন্মুক্ত হয়, কিন্তু বৃহৎ অন্ত্র হইতে কোন দ্রব্য ক্ষুদ্র অন্ত্রে আসিতে পারে না। বৃহৎ অন্ত্রের ভিতর কতকগুলি গ্রন্থি

হইতে একপ্রকার দুর্গন্ধময় পদার্থ নিঃসৃত হইয়া ভুক্তদ্রব্যের অসার অংশকে মলরূপে পরিণত করে; পরে উহা যথাসময়ে বহির্গত হইয়া যায়।

ক্লোম।—গ্রহণী-নালীর বামপার্শ্বে ক্লোম বা প্যানক্রিয়াস্ (pancreas) যন্ত্র অবস্থিত। এই ক্লোম যন্ত্র দৈর্ঘ্যে ৭ এবং প্রস্থে ১½ ইঞ্চি। পাকস্থলী হইতে "কাইম" গ্রহণী-নালীতে আসিলে উহার সহিত যকৃৎ-নিঃসৃত পিত্তরস ও ক্লোম-নিঃসৃত রস একটি নালীপথে আসিয়া মিশ্রিত হয়। ক্লোমরসের সাহায্যে শ্বেতসার সম্পূর্ণরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, এবং উহার ট্রিপসিন (trypsin) নামক পদার্থের সাহায্যে ছানাজাতীয় খাদ্যেরও পরিপাক হয়। তদ্ভিন্ন উহাতে আর একটি এমন পদার্থ থাকে, যাহা তৈল ও বসাজাতীয় পদার্থকে ফেনাকারে পরিণত করিয়া পরিশোষণের উপযোগী করে।

যকৃৎ।—শরীরের মধ্যভাগের দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃৎ বা লিভারের (liver) স্থান। অধস্তন পঞ্জরাস্থির পশ্চাৎভাগে এবং ডায়াফ্রাম নামক পেশীর ঠিক নিম্নে ইহা অবস্থিত। পঞ্জরাস্থি যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার অর্ধ ইঞ্চ নিম্ন পর্যন্ত যকৃৎ বিস্তীর্ণ থাকে। ঐ স্থান টিপিলে উহা অনুভব করা যায়। উহার স্বাভাবিক ওজন ৪০ হইতে ৬০ আউন্স। কিন্তু পীড়া হইলে উহা অনেক বড় হইয়া পড়ে। যকৃৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং উহা কতকগুলি কোষের সমষ্টি। এই কোষগুলির মাঝে অসংখ্য কৈশিক প্রণালী ও রক্তনালী আছে। এই কোষগুলির সাহায্যে পিত্তরস উৎপন্ন হয়। এই পিত্তরস

পিত্তবাহী নালী দিয়া একটি অপেক্ষাকৃত বড় নালীতে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে গ্রহণী-নালীতে আসিয়া পড়ে।

যকৃৎ-নিঃসৃত পিত্তরস বসাজাতীয় খাদ্যের পরিশোষণে সহায়তা করে। এতদ্ভিন্ন ইহা অন্ত্রস্থিত ভুক্তদ্রব্যের পচন ও অন্ত্রকুৎসেচন কিয়ৎ পরিমাণে নিবারণ করে এবং কোষ্ঠের ভিতর দিয়া তাহার সঞ্চারণে সহায়তা করে।

'গ্লাইকোজেন' নামক এক প্রকার পদার্থ যকৃতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; ইহা রূপান্তরিত হইয়া শর্করায় পরিণত হয়। কখন কখন এই শর্করার পরিমাণ এত বেশি হয় যে তাহার সমুদয় ব্যয় হয় না। তখন ইহার অনাবশ্যক অংশ মূত্রের সহিত বাহির হওয়াতে বহুমূত্র (diabetes) রোগ উৎপন্ন হয়।

(৬) নার্ভ-মণ্ডলী

আমাদের দেহের মধ্যে যে কত প্রকার কার্য নিয়ত সম্পাদিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রগুলি তাহাদের নিজ নিজ কার্য সুচারু সম্পন্ন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কার্যকালে যদি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকিত, তাহা হইলে গোলমাল হইয়া যাইত। যন্ত্রাদির মধ্যে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উহাদের কার্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য দেহে নার্ভ-মণ্ডলীর সৃষ্টি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন নার্ভ-মণ্ডলী থাকায় আমরা ইচ্ছা এবং বোধ বা অনুভব করিবার শক্তি লাভ করিয়াছি। নার্ভ-মণ্ডলী না থাকিলে আমাদের সুখ দুঃখ অনুভব করা, চিন্তা করা বা তদনুরূপ কার্য করা অসম্ভব হইত।

মস্তিষ্ক (brain), সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) এবং নার্ভ তন্তুগুলি (nerves) লইয়া নার্ভ-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে।

মস্তিষ্ক।—করোটি বা মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক অবস্থিত। ইহার প্রধান অংশ দুইটি; সেরিব্রম—(cerebrum) এবং

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড
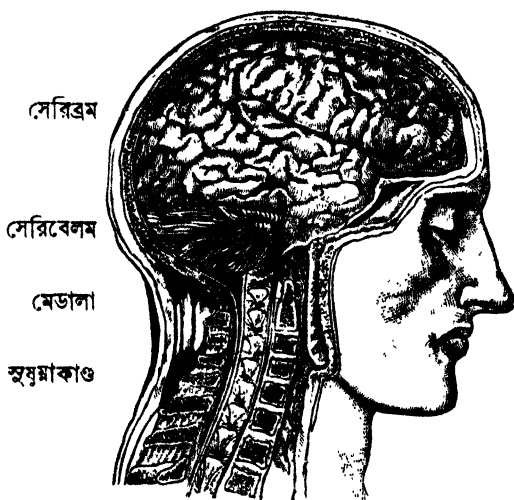
সেরিবেলম (cerebellum)। প্রথমটি বড়, দ্বিতীয়টি ছোট; বড়টি উপরে থাকে এবং ছোটটি নীচে পশ্চাৎ-ভাগে থাকে। উহারা বামে ও দক্ষিণে দ্বিধা বিভক্ত হইলেও, উহাদের পরস্পরের সহিত সংযোগ আছে। সেরিবেলমের নীচে বাম ও দক্ষিণ অংশের সংযোগ স্থলের নাম 'পন্স' (pons)। মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কার্য সম্পাদিত হয়। মস্তিষ্ক অসংখ্য নার্ভ-কোষের দ্বারা গঠিত;

এই কোষগুলি হইতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য তন্তু বাহির হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। মস্তিষ্কের প্রধান কার্য অনুভূতি ও বোধের উদ্রেক করা, এবং মস্তিষ্কের দ্বারাই আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিতে পারি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি নার্ভ দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত আছে। মস্তিষ্কই আমাদের বুদ্ধির আধার এবং চিন্তা, অনুভূতি প্রভৃতি কার্য মস্তিষ্কেই হইয়া থাকে।

সুষুম্নাকাণ্ড।—মস্তিষ্কে যে অসংখ্য নার্ভ-তন্তু আছে সেগুলি মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া নীচে নামিয়া দেহের সর্বত্র চলিয়া গিয়াছে। রজ্জুর আকারে ইহা মেরুদণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে এবং ইহাকে সুষুম্নাকাণ্ড বা মেরুমজ্জা (spinal cord) বলা হয়।

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড আমাদের গলদেশের পশ্চাতে মিলিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত পন্স নামক অংশের অব্যবহিত নীচেই, অর্থাৎ মেরুদণ্ডের প্রথমেই 'মেডালা' (medulla) নামে একটি অংশ আছে। এখানে যদি কখনও গুরুতর চাপ পড়ে বা আঘাত লাগে, তাহা হইলে তখনই আমাদের মৃত্যু হইতে পারে। ফাঁসি হইতে এইজন্য তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

সুষুম্নাকাণ্ড হইতে যে সকল নার্ভ-তন্তু বাহির হইয়াছে সেগুলি চারিদিক হইতে সংবাদ আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। সুষুম্নাকাণ্ড হইতেই ইহার আবশ্যক প্রতিকার সাধিত হয় অথবা সেই সংবাদ মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়।

নার্ভ-তন্তু।—মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড হইতে নার্ভ-তন্তুগুলি বাহির হইয়া দেহের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। টেলিগ্রাফের

তারের সহিত এগুলির তুলনা করা যাইতে পারে। ঐ তার দিয়া যেমন সংবাদ যাওয়া-আসা করে, তেমনই এই নার্ভ-তন্তুগুলির সাহায্যে দেহের সকল স্থান হইতে সংবাদ মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছে, এবং উহাদের ভিতর দিয়াই মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ড হইতে যথোপযোগী কার্য করিবার আদেশ প্রেরিত হয়।

নার্ভগুলি দুই প্রকারের, যথা—অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ। অন্তর্মুখ নার্ভগুলি বাহির হইতে সংবাদ লইয়া মস্তিষ্কের ভিতর পৌঁছাইয়া দেয় এবং মস্তিষ্কে অনুভূতি জন্মায়; ইংরেজীতে এগুলিকে afferent বা sensory nerve বলা হয়। বহির্মুখ নার্ভগুলি মস্তিষ্ক হইতে আদেশ লইয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া নানাবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করায়; ইংরেজীতে এগুলিকে efferent বা motor nerve বলে। উদাহরণ দ্বারা ইহাদের কার্য সহজে বুঝা যাইবে। মনে কর, তোমার পায়ে একটি পিঁপড়া কামড়াইল; পায়ে কষ্ট অনুভব হইবার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের অন্তর্মুখ নার্ভ দ্বারা সেই সংবাদ মস্তিষ্কের গোচর করা হইল। তখন মস্তিষ্ক হইতে বহির্মুখ নার্ভ দ্বারা আদেশ প্রেরিত হইল এবং তুমি হাত দিয়া পিঁপড়াকে দূর করিয়া দিলে। আবার মনে কর, নাকের ভিতরে একটি পালক প্রবেশ করিল। তখনি নাকের অন্তর্মুখ নার্ভ সে সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া গেল এবং পর-ক্ষণেই মস্তিষ্কের বহির্মুখ নার্ভের প্রেরণায় তোমার হাঁচি হইল এবং তাহার ফলে নাক হইতে পালক দূর হইয়া গেল।

পূর্বোক্ত নার্ভগুলি ব্যতীত মেরুদণ্ডের অস্থির দুই পার্শ্বে লূতাতন্তুর আকারে আর কতকগুলি নার্ভ আছে। উহাদিগকে

sympathetic বা 'সমবেদী' নার্ভ বলা হয়। এইগুলি অতীব সূক্ষ্ম। শিরা ও ধমনীর মধ্যে রক্ত নিয়ন্ত্রণ করা, ঘর্ম উৎপাদন করা, দেহের উত্তাপ রক্ষা করা, পরিপাক ক্রিয়ার জন্য যে-সকল রস নিঃসরণ হয় উহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা, অনৈচ্ছিক পেশীর কার্যের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি নানাবিধ ক্রিয়ার সহিত এই নার্ভগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

(৭) রস-নিঃসারক ও দূষণীয় পদার্থ বহিষ্কারক যন্ত্রাদি

রস-নিঃসরণ।—আমাদের দেহের ভিতর অনেক রকম রসের নিঃসরণ হইয়া থাকে; এই সব রস দেহের নানা কার্যে ব্যবহৃত হয়। দেহের স্থানে স্থানে ছোট বড় বহু প্রকার রস-নিঃসারক গ্রন্থি বা গ্লাণ্ড (gland) আছে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে সেগুলির ভিতর কতকগুলি নলির অস্তিত্ব দেখা যায়। এই নলিগুলিতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বহু কোষ (cell) সাজান থাকে। অত্যন্ত ছোট গ্রন্থিগুলিতে কেবল একটি নলি থাকে, কিন্তু বড় গ্রন্থিগুলিতে অনেক নলি থাকে। এই নলিগুলির ভিতর সজ্জিত কোষগুলি হইতেই রস নিঃসরণ হইয়া থাকে। লালা, পাকরস, আন্ত্রিক রস ইত্যাদি এইরূপে নিঃসৃত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের স্তনে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহাও ইহার আর একটি উদাহরণ।

দূষণীয় পদার্থ বহিষ্করণ।—আমরা প্রত্যহ খাদ্য ও পানীয় রূপে যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহার সার ভাগ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহের নানা কার্যে ব্যবহৃত হয়, এবং অসার ভাগ

পড়িয়া থাকে। ইহা ছাড়া আমাদের দেহের ভিতর সর্বদা যে ক্ষয় হইতেছে তাহার ফলেও নানা দূষণীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই সব পদার্থ দেহ হইতে বাহির হইয়া না গেলে আমাদের পীড়া জন্মে। এইজন্য দেহের ভিতর এমন কতকগুলি যন্ত্রাদি আছে যাহাদের সাহায্যে এগুলি বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই যন্ত্রাদির মধ্যে ফুসফুস, মূত্রগ্রন্থি এবং গাত্রচর্মই প্রধান।

ফুসফুস।—দূষণীয় পদার্থ বহিষ্করণে ফুসফুস কিরূপে সাহায্য করে তাহা শ্বাসক্রিয়া বর্ণনাকালে পূর্বেই বলা হইয়াছে। রক্ত যখন ফুসফুসের ভিতর শ্বাসবায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে উহা কার্বনিক অ্যাসিড ইত্যাদি পরিত্যাগ করে এবং তাহা পরিত্যক্ত প্রশ্বাসবায়ুর সঙ্গে বাহির হইয়া যায়।

বৃক্ক।—আমাদের দেহে দুইটি মূত্রগ্রন্থি বা বৃক্ক (kidney) আছে। উহারা মেরুদণ্ডের বামে ও দক্ষিণে পাকস্থলীর পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত। উহারা বক্রাকৃতি, গ্রন্থিময় এবং দেখিতে কতকটা ৫ এর মত। অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় উহাদের গঠনে কতকগুলি নলাকার পদার্থের মধ্যে বহুসংখ্যক কোষের সমাবেশ আছে এবং উহাদের ভিতর অনেক রক্তবহা ধমনী ও শিরা আছে। প্রত্যেক বৃক্ক হইতে একটি করিয়া নল বাহির হইয়া নীচে চলিয়া গিয়াছে; ইহার নাম গবিনী বা ইউরিটার (ureter)। এই নলের ভিতর দিয়া বৃক্কের নিঃসরণ ক্রমে ক্রমে মূত্রাশয় বা ব্লাডারে (bladder) যাইয়া জমে এবং সেখান হইতেই প্রস্রাবের আকারে বাহির হইয়া যায়। বৃক্কের ভিতর প্রবাহিত রক্ত হইতেও নানাপ্রকার দূষণীয় পদার্থ জলের সহিত মূত্রাকারে বাহির হইয়া যায়। মূত্র অল্প অল্প করিয়া

নিঃসৃত হইয়া গবিনী নামক নালীর ভিতর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে মূত্রাশয়ে যাইয়া জমে। মূত্রাশয় পূর্ণ হইলে প্রস্রাবের বেগ অনুভূত হয় এবং তখন আমরা নানাবিধ দূষণীয় পদার্থে পূর্ণ সেই মূত্র দেহ হইতে বাহির করিয়া ফেলি।
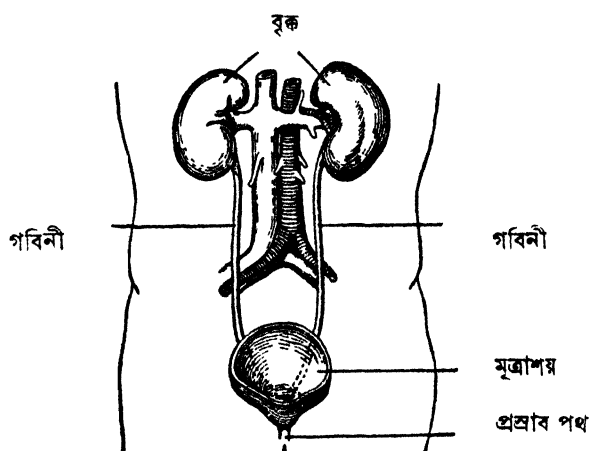
প্রস্রাব।—প্রস্রাবের স্বাভাবিক রং হরিদ্রাভ। ইহার প্রধান উপকরণ জল এবং ইউরিয়া (urea)। এতদ্ব্যতীত লবণ, কয়েকটি ধাতব পদার্থ ও কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস প্রস্রাবে থাকে। বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রই প্রত্যহ সুস্থাবস্থায় ৪০ হইতে ৬০ আউন্স প্রস্রাব ত্যাগ করে। এই পরিমাণের কমবেশি অনেক সময়ে হইয়া থাকে। বেশি পরিমাণ জল পান করিলে প্রস্রাব বেশি হয়। গ্রীষ্মকালে গাত্রচর্ম হইতে অধিক পরিমাণে ঘর্ম নিঃসরণ হওয়ায় প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যায়;

শীতকালে আবার প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ে। জ্বর হইলে দেহে দূষণীয় পদার্থের পরিমাণ বাড়ে, সেজন্য তখন প্রস্রাবের রঙ লাল হয়।

গাত্রচর্ম।—অণুবীক্ষণের সাহায্যে গাত্রচর্ম পরীক্ষা করিলে উহার ভিতর দুইটি স্তর দেখা যায়। বাহিরের স্তরটির নাম বহিস্ত্বক্ বা এপিডারমিস (epidermis)। উহাতে সারি সারি

A (a) এপিডারমিস
(b) রঙযুক্ত কোষের স্তর
(d) (e) ডারমিস
(f) চাব
(g) ঘর্ম গ্রন্থি
(h) নলী
(i) ঘর্ম রন্ধ্র
B—(c) লোমকূপ ও গ্রন্থি
(b) অতি সূক্ষ্ম পেশী

গাত্রচর্ম
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ আছে, কিন্তু রক্তের নালী বা অন্য কিছু দেখা যায় না। ঐ কোষগুলি বাহির দিক হইতে ক্রমে ক্রমে পড়িয়া যায়। শীতের সময় গা রগ্‌ড়াইলে যে "খড়ি" উঠে, তাহা এই পরিত্যক্ত কোষগুলি হইতেই উৎপন্ন হয়। নিম্নের কোষগুলিতে একপ্রকার রঙ আছে। এই রঙের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহের বর্ণের তারতম্য হইয়া থাকে; রঙ কম থাকিলে দেহ গৌরবর্ণ হয় এবং বেশি থাকিলে কাল হয়।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষের দেহে এই রঙ বেশি থাকায় তাহারা প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ হয়। রৌদ্রের প্রভাবে চর্মে এই রঙ বেশি করিয়া জমে।

চর্মের নিম্নস্তরের নাম অন্তস্তক্ বা ডারমিস্ (dermis)। দেহের উপর যে কেশ পাওয়া যায় তাহার গোড়াগুলি ঐ ডারমিসের মধ্যে দেখা যায়। ইহার ভিতর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে এবং উহার সঙ্গে বহু রক্তনালী থাকায় ঐ স্থান কাটিয়া গেলে বা জোরে রগ্‌ড়াইলে রক্তপাত হয়। গ্রন্থিগুলি হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল চর্মের উপরের স্তর অবধি ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কতকগুলি গ্রন্থি হইতে স্নেহ জাতীয় পদার্থ বাহির হয়। গ্রন্থিগুলি অধিকাংশই ঘর্মকূপ এবং সেগুলি হইতে দূষণীয় পদার্থ ঘর্মের সহিত নিঃসৃত হইয়া যায়। গ্রন্থিগুলির আশেপাশে অতি সূক্ষ্ম পেশী আছে।

ঘর্মের প্রধান উপাদান জল, কিন্তু সেই জলের সহিত স্নেহ পদার্থ, লবণ ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। ঘর্ম এবং মূত্রের সহিত দূষণীয় পদার্থগুলি বাহির হইয়া না যাইলে, দেহ সুস্থ থাকা অসম্ভব হইত। আমাদের সুস্থদেহে প্রত্যহ প্রায় তিন পোয়া ঘর্ম নির্গত হইয়া থাকে। শীতকালে কম কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহা অত্যন্ত বেশি হয়।

ঘর্ম সব সময় আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু দেখা না গেলেও সব সময়ই গাত্রচর্ম হইতে ঘর্ম বাহির হইতেছে। যখন উহা অতি ধীরে ধীরে বাহির হয়, তখন উহা সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া অদৃশ্য হয়। গ্রীষ্মকালে, বা পরিশ্রম

করিলে অথবা ব্যায়ামকালে, ঘর্ম বেশি বাহির হয় এবং তখন উহা বেশ দেখা যায়।

গাত্রচর্মে ময়লা জমিলে ঘর্মকূপগুলির মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তখন ঘর্মনিঃসরণের ব্যাঘাত হওয়ায় দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে। *সেজন্য* প্রত্যহ স্নান করা এবং যথাসাধ্য গাত্রচর্ম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। অপরিষ্কার গাত্রে নানাবিধ চর্মরোগ হয়।

রেক্‌টম।—ভুক্তদ্রব্যের যাহা কিছু জীর্ণ না হইয়া অবশিষ্ট থাকে, তাহা ক্রমে মল বা বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। উহা অন্ত্রের সর্বশেষ ভাগ রেক্‌টম (rectum) নামক অংশে যাইয়া পড়ে। সেখানে মল জমিলে আবশ্যক মত মাংসপেশীর চাপে বহিষ্কৃত হইয়া যায়। এই রেক্‌টমের নিম্নপ্রান্তই মলদ্বার; ইহার ভিতর দিয়াই মল নির্গত হয়। নিয়মিত ভাবে মল বাহির হইয়া না গেলে আমাদের দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে।

(৮) পঞ্চেন্দ্রিয়

আমাদের দেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। তাহাদেরই সাহায্যে আমরা বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

১। **দর্শনেন্দ্রিয়**।—চক্ষুই আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষুর সহিত আলোকচিত্র গ্রহণের যন্ত্র ক্যামেরার তুলনা করা

যাইতে পারে। কিন্তু চক্ষুর গঠন ক্যামেরা হইতে অনেক বেশি জটিল। ইহার কার্যক্ষমতাও অতীব বিস্ময়কর। আমরা ক্যামেরা নির্মাণকার্যে চক্ষুর কতকটা অনুকরণ করিয়াছি মাত্র।

চক্ষু দেখিতে গোলাকার। ইহা নাসিকার দুই পার্শ্বে দুইটি অস্থি-কোটরের মধ্যে এমনভাবে অবস্থিত যে, শীঘ্র ইহাতে কোন আঘাত লাগিতে পারে না। মস্তিষ্কের সহিত চক্ষু দুইটি অপ্‌টিক (optic) নার্ভ দ্বারা সংযুক্ত। চক্ষুর শ্বেত অংশটি উহার উপরের একটি অপেক্ষাকৃত পুরু ও কঠিন আবরণ; তাহাকে শ্বেতমণ্ডল বা স্ক্লিরটিক (sclerotic) আবরণ বলা হয় (পরপৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। উহার সম্মুখ ভাগে বা চক্ষুর মাঝখানে যে যে স্বচ্ছ গোলাকার ছোট অংশ দেখা যায়, তাহার নাম কর্নিয়া (cornea)। স্ক্লিরটিক আবরণের ভিতর কোরয়েড (choroid) নামক, বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তনালী ও নার্ভ-তন্তুপূর্ণ, স্তরের সমাবেশ দেখা যায়। এই কোরয়েড স্তরের উপর অতি সূক্ষ্ম যে আর একটি স্তর চক্ষুর মধ্যে বিস্তৃত হইয়া অবস্থিত আছে, তাহার নাম অক্ষিপট বা রেটিনা (retina)। মস্তিষ্ক হইতে যে অপ্‌টিক নার্ভ বাহির হইয়া চক্ষুতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু হইতে এই কৃষ্ণবর্ণের স্তর গঠিত হইয়াছে। ইহার অনুভব শক্তি অতীব প্রখর। ইহা অনেকটা দর্পণের ন্যায় এবং ইহার উপরেই সকল দ্রষ্ট পদার্থের প্রতিকৃতি বা ছবি আসিয়া পড়ে। অপ্‌টিক নার্ভ কাটিয়া দিলে দর্শনশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; তখন চক্ষু থাকিয়াও আমরা দেখিতে পাই না। অতএব আমরা চোখ দিয়া দেখি একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

মস্তিষ্কের অনুভূতির ফলে আমরা দেখিতে পাই ; চোখে দ্রব্যাদির ছায়া পড়ে মাত্র। .
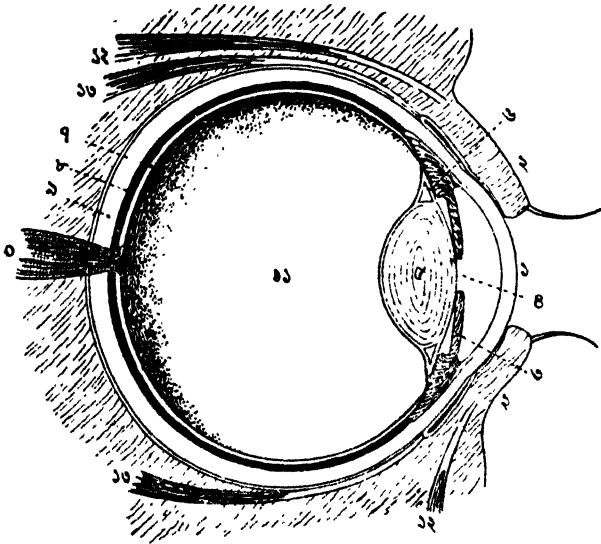
দর্শনেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশ

১। কর্নিয়া	২। চক্ষুর পাতা	৩। কনীনিকা
৪। মণি	৫। লেন্স	৬। লেন্সের বন্ধনী
৭। অক্ষিপট	৮। কোরয়েড	৯। স্ক্লিরটিক
১০। অপ্‌টিক নার্ভ	১১। চক্ষুকোটর	১২, ১৩। মাংসপেশী

চক্ষুর সম্মুখ ভাগে কর্নিয়ার ঠিক পশ্চাতে সূক্ষ্ম পেশী দ্বারা নির্মিত গোলাকার একটি পর্দা আছে। ইহার নাম কনীনিকা বা আইরিস (iris)। আলোকরশ্মির উপরে ইহার সঙ্কোচন ও প্রসারণ নির্ভর করে। ইহার মাঝখানে যে ছোট

ছিদ্র দেখা যায়, তাহারই নাম পিউপিল (pupil) বা চোখের মণি। এই মণিকে ঘিরিয়া সূক্ষ্ম পেশীগুলি এমনভাবে বসান আছে যে, উহাদের সঙ্কোচনে ছিদ্রটি বড় হয় এবং প্রসারণে ছোট হইয়া যায়। সেইজন্যই উজ্জ্বল আলোক পড়িলে মণি ছোট হয় এবং মৃদু আলোকে বড় হয়। তেমনি দূরের দ্রব্য দেখিবার সময় মণি বড় হয় এবং নিকটের দ্রব্য দেখিবার সময় ছোট হয়।

কর্নিয়া নামক চক্ষুর স্বচ্ছ অংশ এবং কনীনিকা বা আইরিস্ নামক পেশীর পর্দার মধ্যে যে ক্ষুদ্র স্থান আছে তাহাকে চক্ষুর সামনের কোটর (anterior chamber) বলে। ইহারই পশ্চাতে ক্যামেরার মত লেন্স (lens) স্থাপিত আছে। এই কোটরে যে তরল পদার্থ থাকে তাহাকে জলীয় হিউমার (aqueous humour) বলে। এই কোটরের পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত বড় দ্বিতীয় কোটরে জেলির মত যে পদার্থ আছে তাহাকে ভিট্রিয়স হিউমার (vitreous humour) বলে। এই হিউমার দ্বারা চক্ষুর গোলকত্ব রক্ষিত হয়। লেন্সের সাহায্যে আলোক-রশ্মি আবশ্যক মত বাঁকিয়া দূরের এবং নিকটের দ্রব্যাদির প্রতিমূর্তি স্পষ্ট করিয়া অক্ষিপটের উপর প্রতিবিম্বিত করে।

যখন কোন দ্রব্য হইতে আলোক-রশ্মি কর্নিয়া ভেদ করিয়া ও মণির মধ্য দিয়া লেন্সের উপর পড়ে তখন আমরা সেই দ্রব্য দেখিতে পাই। তখন মণির সঙ্কোচন বা প্রসারণের ফলে দ্রষ্ট দ্রব্যের সঠিক ছায়া অক্ষিপটের উপর প্রতিবিম্বিত হয়। অক্ষিপটের সহিত নার্ভ-তন্তু দ্বারা মস্তিকের যোগ থাকায় ঐ

ছায়ার অনুভূতি সেখানে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই আমরা ঐ দ্রব্য দেখিতে পাই। সেইজন্যই আমরা পূর্বে বলিয়াছি, দর্শনকার্য মস্তিষ্কে সম্পাদিত হয়; চক্ষু কেবল বহির্জগতের ছবি লইয়া অপ টিক নার্ভের ভিতর দিয়া মস্তিষ্ককে জানাইয়া দেয়।

চক্ষুর সহিত কতকগুলি মাংসপেশী সংযুক্ত আছে, তাহাদের সাহায্যে চক্ষুগোলক নানা দিকে ঘুরান ফেরান যায়। চক্ষুর পাতা ও লোমগুলি থাকায় সহজে চক্ষুতে ময়লা প্রবেশ করিতে পারে না। আবার ভ্রূ থাকায় ঘর্ম বা অন্য কোন দ্রব্য চক্ষে পড়িতে পারে না। চক্ষুর কোণে কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে, সেগুলি হইতে জলীয় নিঃসরণ আসিয়া সর্বদা চক্ষুকে ভিজাইয়া রাখে। চক্ষুর সাহায্যেই আমরা বহির্জগতের সর্বপ্রকার জিনিস সুন্দরভাবে ধারণা করিতে পারি, এবং চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত আলোক, বর্ণ, আকার, গতি ইত্যাদি অনুভূত হইতে পারে না। এইজন্যই চক্ষুকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান বলা হয়।

সাধারণত যেখানে আলোকের অভাব সেরূপ স্থানে বসিয়া অধিককাল লেখাপড়া করা অথবা সেলাই প্রভৃতি কার্য করায় চক্ষের পীড়া হইয়া থাকে। বাহিরের কোন দ্রব্য পড়িলে, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা অথবা প্রখর রৌদ্র লাগিলে, দূষিত বায়ুতে বসবাস করিলে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, কিংবা দেহ অন্য কারণে অসুস্থ হইলে সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর পীড়া জন্মে। বসন্ত ব্যাধিতে কখন কখন চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়; আবার চিকিৎসার অভাবে বা দোষে অনেকে চক্ষু হারায়।

সুস্থ লোকের মধ্যেও বহু ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তিতে দুই

প্রকার দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ দূরবর্তী জিনিস পরিষ্কার দেখিতে পায় না, কাহারও বা নিকটবর্তী দ্রব্যাদি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে কষ্ট হয়। এই দুইটি অবস্থাকে "short-sight" ও "long-sight" বলে। এগুলি চক্ষু-গোলকের গঠনের দোষে উৎপন্ন হয়। যাহাদের এই দোষ থাকে প্রায়ই তাহাদের চক্ষু টন্ টন্ করে ও তাহা হইতে জল পড়ে, মাথা ধরে ও ক্রমে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার ক্ষমতার হ্রাস হইয়া যায়। উপযুক্ত চশমা ব্যবহারে প্রায়ই এই সকল দোষ সংশোধন করা যায়। অতএব বালকদিগের চক্ষু পরীক্ষা করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করা অভিভাবকদের কর্তব্য।

চক্ষু ভাল রাখিতে সর্বদা যত্ন করিবে এবং কখনও উহাদের অন্যায় ও অতিরিক্ত ব্যবহার করিবে না। অতি মৃদু আলোকে অথবা প্রখর রৌদ্রে বসিয়া পাঠাভ্যাস বা সেলাই করিবে না। সম্মুখে তীব্র আলোক রাখিয়া রাত্রে লেখাপড়া করাও অনিষ্টকর। এমন ভাবে আলোক স্থাপন করিবে যেন তাহা পুস্তকের উপর যাইয়া পড়ে অথচ সোজা তোমার চক্ষের উপর না যায়। অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে এবং ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে মুদ্রিত পুস্তক যতদূর সম্ভব পরিহার করিবে। বিছানায় শয়ন করিয়া পাঠাভ্যাস করা চক্ষুর পক্ষে অপকারী তাহা স্মরণ রাখিবে। কিছুক্ষণ চক্ষুকে নিযুক্ত রাখার পর কিয়ৎকালের জন্য আবার উহাঁর বিশ্রাম দিবে। চক্ষু সর্বদা নির্মল জলে ধুইয়া পরিষ্কার রাখিবে। চক্ষুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিবে না, কারণ কোন কোন

চক্ষু-রোগ অতি সহজে দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়। দৃষ্টিশক্তির কোনপ্রকার দোষ হইলেই বিলম্ব না করিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

২। **শ্রবণেন্দ্রিয়**।—কর্ণ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়। উহা মস্তিষ্কের দুইদিকে, বাহির হইতে আরম্ভ হইয়া ভিতর অবধি চলিয়া গিয়াছে। উহাকে তিন অংশে ভাগ করা যায়, যথা ঃ—বাহিরের অংশ, মধ্যের অংশ বা মধ্যকর্ণ এবং ভিতরের অংশ বা অন্তঃকর্ণ।

কানের বাহিরের অংশের প্রধান কার্য শব্দকে বা শব্দের তরঙ্গগুলিকে ধরা। উহা একটা শামুকের খোলের (shell) মত। উহা চর্ম ও উপাস্থি (cartilage) দ্বারা গঠিত। উহা হইতে একটি পথ (canal) মধ্যকর্ণ অবধি চলিয়া গিয়াছে, তাহা লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি। এখানে কতকগুলি গ্রন্থি হইতে মোমের মত একপ্রকার নিঃসরণ হয়, তাহাকে কানের 'খোল' বলা হয়। ধারে ধারে লোমাবলী থাকায় ধূলা, বালি, কীটাদি এ পথে প্রবেশ করিতে গেলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই পথের প্রান্তে একটি সূক্ষ্ম পর্দা আছে, তাহাকে কর্ণের পটহ (tympanic membrane) বা ড্রাম (drum) বলে। কোন শব্দ কানের নিকট আসিলেই উহার তরঙ্গগুলি ঐ সূক্ষ্ম পথে চালিত হইয়া এই পটহে আঘাত করে। কানের উপর জোরে আঘাত করিলে, ভয়ানক উচ্চ শব্দ করিলে, কিংবা কানের ভিতরে বাহিরের বস্তু প্রবেশ করাইলে এই পর্দা ছিন্ন হইতে পারে। কানের কোন কোন পীড়াতেও ঐ পর্দা নষ্ট হইয়া যায়। পর্দা নষ্ট হইলে বধিরতা উৎপন্ন হয়।

এই পর্দার পরেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যের অংশ বা মধ্যকর্ণ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে তিনখানি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অস্থি আছে। একখানি দেখিতে হাতুড়ির (hammer) মত, দ্বিতীয়খানি দেখিতে নেহাই (anvil) যন্ত্রের মত এবং তৃতীয়খানি পা-দানির (stirrup)
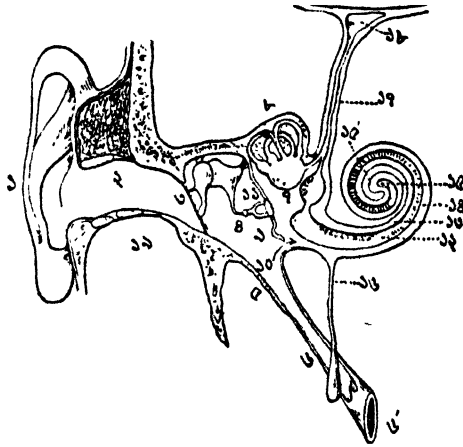
শ্রবণেন্দ্রিয়

১। বহিঃকর্ণ
২। সুড়ঙ্গ পথ
৩। পটহ
৪। কণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অস্থিগুলি
৫, ৬।৬´। ইউস্টেকিয়ান টিউব
১৭। ভেস্টিবিউল
৮। সেমি সাকুলার ক্যানাল
৯। প্রমণ্টরি
১০। রোটণ্ডা
১১। বায়ুপূর্ণ স্থান
১২,১৩,১৪,১৫,১৬। ককলিয়া
১৮। গ্রন্থি
১৯। পেরটিড অস্থি

অনুরূপ। পটহে শব্দ ধ্বনিত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে এই অস্থিগুলি কাঁপিয়া উঠে। মধ্যকর্ণের কোঠরের তলায় একটি ছিদ্র আছে, উহা একটি নল দ্বারা কণ্ঠদেশের সহিত সংযুক্ত। এই নলের

নাম শ্রুতিনালী বা ইউস্টেকিয়ান টিউব (eustachian tube); উহার ভিতর দিয়া বায়ু কর্ণে প্রবেশ করে।

ভিতরের অংশ বা অন্তঃকর্ণ বলিলে একখানি ঘন অস্থির ভিতর একটি ক্ষুদ্র কোঠা বা গহ্বর বুঝায়। ইহার মধ্যবর্তী অংশের নাম ভেস্টিবিউল (vestibule); ইহার একদিকে তিনটি অর্ধ চক্রাকার নালীপথ (semi-circular canal) ও অন্য দিকে কক্লিয়া (cochlea) নামক অংশ দেখা যায়। শব্দ কানে প্রবেশ করিয়া পটহে আঘাত করিলেই উহা মধ্যকর্ণের অস্থিগুলিতে যাইয়া লাগে এবং তখন মধ্যকর্ণ হইতে শব্দ অন্তঃকর্ণে চলিয়া যায়। এই অন্তঃকর্ণ হইতে শ্রবণ-নার্ভ (auditory nerve) দ্বারা শব্দের অনুভূতি মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়।

যাহা বলা হইল তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কানের ভিতরের বন্দোবস্ত অতি সূক্ষ্ম। অতএব ইহা সহজেই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক কানের পীড়া অতি সামান্য কারণে উৎপন্ন হয় এবং প্রথম হইতে সাবধান না হইলে পরিণামে বধিরতা জন্মে।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগাইলে, অত্যন্ত জোরে শব্দ করিলে, কানের ভিতর কোন কাঠি বা অন্য কোন দ্রব্য প্রবেশ করাইলে, অথবা কানে পূঁয হইলে প্রথম হইতেই চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করিলে কর্ণ-পটহ নষ্ট হইয়া যায়। একবার নষ্ট হইলে আর কিছুতেই তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। কান হইতে খোল বাহির করিবার জন্য কঠিন কানখুস্কি ব্যবহার অতীব বিপজ্জনক, ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিবে। নাপিত দ্বারা 'কান দেখান' প্রথা অতীব অনিষ্টকর; অনেক সময়ে ইহাদের

যন্ত্রের আঘাত লাগিয়া পটহ ছিন্ন হইয়া যায় অথবা উহাতে ছিদ্র উৎপন্ন হয়। খোল বাহির করিতে হইলে অল্প পরিমাণ গ্লিসারিন অথবা স্পিরিট কানে ঢালিয়া দিলে সহজেই উহা বাহির হইয়া আসে। কানে কাঠি দিবার অভ্যাস করিবে না।

৩। **ঘ্রাণেন্দ্রিয়।**—ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলিলে নাসিকা বুঝায়। পূর্বে নাসিকাকে শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র বলিয়া আমরা বর্ণনা করিয়াছি; কারণ উহা শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথ রূপে শ্বাসযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহা ছাড়া নাসিকা দ্বারা আমরা সকল বস্তুর ঘ্রাণ পাইয়া থাকি। নাসিকার মধ্যে যে রন্ধ্র আছে তাহাতে মস্তিষ্ক হইতে এমন কতকগুলি নার্ভ-তন্তু আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাদের দ্বারা দ্রব্যাদির ঘ্রাণ মস্তিষ্কে যাইয়া পৌঁছে। এই গন্ধবাহক নার্ভের নাম অল্‌ফ্রাকটরি (olfactory) নার্ভ। কোন গন্ধদ্রব্যের রেণু বা অতি সূক্ষ্ম কণিকা ঐ নার্ভ-তন্তুগুলিতে আঘাত করিলেই উহার ঘ্রাণ মস্তিষ্ক অনুভব করে।

৪। **স্বাদেন্দ্রিয়।**—জিহ্বাই আস্বাদের ইন্দ্রিয়। উহাতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নত অংশ দৃষ্ট হয় এবং যাহাদিগকে প্যাপিলি বলে, সেগুলির ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসগ্রন্থি আছে। উহারা বিভিন্ন প্রকার আস্বাদ গ্রহণের যন্ত্রস্বরূপ। পরিপাক-যন্ত্র বর্ণনাকালে আমরা উহার উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থি-গুলির সহিত নার্ভ-তন্তু দ্বারা মস্তিষ্কের যোগ আছে। অতএব খাদ্যদ্রব্য জিহ্বায় ঠেকিলে এবং চর্বণকালে উহার উপর পড়িলে উহাদের আস্বাদ মস্তিষ্কে অনুভূত হয়।

৫। **স্পর্শেন্দ্রিয়।**—স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্থান প্রধানত গাত্রের ত্বকে। ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ করিয়া আমরা দ্রব্যাদির অস্তিত্ব ও উহাদের বিশেষ অবস্থাগুলি বুঝিতে পারি। মুখ, নাক ইত্যাদিতে স্পর্শশক্তি আছে। কোন পদার্থ উষ্ণ কি শীতল, নরম কি কঠিন, মসৃণ কি খস্‌খসে তাহা স্পর্শ দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি। কোন স্থানের ত্বকের অনুভূতি-শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি, আবার কোথায়ও কম। চক্ষুর সাহায্যে কোন দ্রব্যের ধারণা করিবার পর, ত্বকের স্পর্শশক্তির সাহায্য লইয়া আমরা সেই দ্রব্য সম্বন্ধে আরও কতকগুলি বিষয়ের ধারণা করিতে সক্ষম হই। ইহা না হইলে দ্রব্যের সম্পূর্ণ ধারণা হয় না। বাস্তবিক দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয় এই দুইএর সমাবেশে দ্রব্যাদির ধারণা সম্পূর্ণ হয়। ত্বক্ হইতে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভ-তন্তু মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ত্বকের মধ্যে স্পর্শ দ্বারা অনুভূতি উৎপন্ন হইলে ইহারাই তাহা মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডে লইয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বায়ু

বায়ুমণ্ডল।—সমগ্র পৃথিবীকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া যাহা অদৃশ্য ভাবে আকাশমার্গের বহুদূর অবধি বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার নাম বায়ুমণ্ডল। আমাদের চক্ষে যাহা শূন্য বলিয়া মনে হয় তাহা এই বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ। পৃথিবীর সর্বত্রই বায়ু সর্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে আমরা সতত বাস করিতেছি। মৎস্য যেমন অগাধ সমুদ্রতলে বাস করে, তেমনি আমরাও এই বায়ু-সমুদ্রে সতত মগ্ন রহিয়াছি। ভূমি হইতে যত ঊর্ধ্বে উঠা যায়, বায়ুর স্তর ততই পাতলা ও লঘু হইতে থাকে। মাইল কতক উপরে উহা এত পাতলা ও লঘু যে তাহাতে শ্বাসক্রিয়া অসম্ভব।

বায়ুর আবশ্যকতা।—যে বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে আমরা সতত বাস করি তাহাই আমাদের জীবনধারণের সর্বপ্রধান উপকরণ। প্রতি মুহূর্তে নাক ও মুখের ভিতর দিয়া এই বায়ু আমাদের দেহের ভিতর যাতায়াত করিতেছে। খাদ্যদ্রব্য না খাইয়া কিছুদিন বাঁচা যায়, এবং বিনা জলে চার পাঁচ দিন বাঁচিয়া থাকা যায়, কিন্তু বায়ু না পাইলে তিন চার মিনিটের অধিক প্রাণরক্ষা অসম্ভব। নাক, মুখ এক সঙ্গে বন্ধ করিয়া নিশ্বাস রোধ করিলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যে কষ্ট হয় তাহাতেই বায়ুর আবশ্যকতা বেশ বুঝা যায়। এইজন্যই বায়ুকে জীবের প্রাণ বলা হয়।

(১) বিশুদ্ধ বায়ু

বায়ুর উপাদান।—বায়ু একটি বাষ্পীয় পদার্থ; নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন নামক দুইটি গ্যাসের মিশ্রণে ইহা উৎপন্ন হয়। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া দুর্ঘট। সচরাচর যাহাকে বিশুদ্ধ বায়ু বলা হয় তাহাতেও সামান্য পরিমাণ কার্বনিক অ্যাসিড, জলীয় বাষ্প, আমোনিয়া, ওজোন ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। বায়ু বিশ্লেষণ করিয়া ১০০ ভাগের মধ্যে পাওয়া যায়—

অক্সিজেন	২০.৯ ভাগ
নাইট্রোজেন	৭৮.৯ ,,
কার্বনিক অ্যাসিড	.০৪ ,,
জলীয় বাষ্প	অল্প পরিমাণ
আমোনিয়া	,,
ওজোন	,,

বায়ুর রূপ ও গুণ।—বায়ুর কোন রূপ বা গন্ধ নাই। আমরা বায়ু দেখিতেও পাই না। বায়ু যখন বেগে প্রবাহিত হয় তখনই কেবল আমরা তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। বায়ু অত্যধিক ঠাণ্ডা করিয়া উহার উপর প্রবল চাপ প্রয়োগ করিলে উহার গ্যাসীয় ভাব পরিবর্তিত হইয়া উহা তরল আকারে পরিণত হয়। তেমনই উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহার আয়তন বর্ধিত হয় ও উহা পাতলা হইয়া পড়ে।

বায়ুতে অক্সিজেন।—বায়ুর উপাদানগুলির মধ্যে অক্সিজেন সর্বপ্রধান। সকল জীবজন্তুরই প্রাণধারণের জন্য উহা একান্ত

প্রয়োজনীয়। এই অক্সিজেন ব্যতীত দীপের আলোক বা কোন আগুন জ্বলে না। বায়ুর প্রবাহ রোধ করিলে অক্সিজেনের অভাবে আগুন ও আলোক নিবিয়া যায়; অন্যদিকে, জোরে হাওয়া দিলে আগুন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলে। হাপর যন্ত্রের দ্বারা, অথবা নলের ভিতর দিয়া ফুঁ দিয়া, কিংবা পাখার বাতাস করিয়া, আগুন ধরান বা উহা প্রজ্বলিত করার ব্যবস্থা সর্বত্র দেখা যায়। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা আগুনে বেশি পরিমাণে অক্সিজেন প্রবেশ করে বলিয়াই তাহা শীঘ্র দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। আমাদের দেহের শিরাগুলির (veins) দূষিত কালচে রক্ত, ফুসফুসের ভিতরে বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া, বিশুদ্ধ হয় এবং ইহার ফলে ধমনীগুলিতে (arteries) উজ্জ্বল লাল রক্ত পাওয়া যায়। এই লাল রক্ত দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হইয়া অক্সিজেন সরবরাহ করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে অক্সিজেন বিনা প্রাণধারণ করা যায় না তাহা বায়ু হইতেই পাওয়া যায়। অক্সিজেন দ্বারা ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া শরীর পরিপুষ্ট করিবার উপযোগী হয়। অক্সিজেন দ্বারা দেহের মধ্যে উত্তাপ উৎপন্ন হয় ও শরীরের প্রয়োজনীয় উত্তাপ সংরক্ষিত হয়।

বায়ুতে নাইট্রোজেন।—বায়ুতে অক্সিজেনের সহিত নাইট্রোজেন মিশ্রিত আছে বলিয়া বায়ুর তীব্রতা নষ্ট হইয়া উহা আমাদের শ্বাসক্রিয়ার উপযোগী হইয়াছে। বায়ুতে যদি কেবল অক্সিজেন থাকিত তাহা হইলে জীবমাত্রেই ভস্মীভূত হইয়া যাইত।

বায়ুতে কার্বনিক অ্যাসিড।—আমরা নাক ও মুখ দিয়া নিয়ত শ্বাস টানিতেছি ও ফেলিতেছি। সুস্থাবস্থায় আমাদের মিনিটে প্রায়

১৮-২০ বার শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ে। উহা হইতে ফুসফুসের ভিতর বায়ু প্রবেশ করিলে অক্সিজেন রক্তস্রোতে যাইয়া মিশে, এবং কার্বনিক অ্যাসিড ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ দেহ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া সেই বায়ুর সহিত বাহির হইয়া আসে। এজন্য ফুসফুস হইতে বহির্গত বায়ুতে কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে।

ফুসফুস হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় বায়ুতে কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা প্রায় ১০০ হইতে ১২০ গুণ বৃদ্ধি পায়। এই কার্বনিক অ্যাসিডের অস্তিত্ব অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। একটি পরিষ্কার কাচের শিশিতে কিছু চুনের জল ঢালিয়া, একটি নল দ্বারা তাহার ভিতর ফুঁ দিয়া প্রশ্বাস বায়ু প্রবেশ করাইলে শীঘ্রই ঐ চুনের জল ঘোলা হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, চুনের সঙ্গে কার্বনিক অ্যাসিড মিলিয়া তখন সেখানে ক্যালসিয়ম কার্বনেট বা চাখড়ি প্রস্তুত হয়। প্রতি ঘণ্টায় আমাদের এক একজনের দেহ হইতে এইরূপে প্রায় ৩/৫ বর্গফুট পরিমাণ কার্বনিক অ্যাসিড বাহির হইয়া আসে। বয়স, শারীরিক অবস্থা, পরিশ্রমের হ্রাস ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ পরিমাণ কম বেশি হয়।

বায়ুতে জলীয় বাষ্প।—দিবারাত্রে আমাদের দেহ হইতে প্রায় ২৫ হইতে ৪০ আউন্স জলীয় বাষ্প ফুসফুসের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায়। একখানি কাচের উপর বা একটুকরা ব্লটিং কাগজের উপর নিশ্বাস ফেলিলে অথবা হাই ছাড়িলে সে স্থান ভিজা ভিজা বোধ হয় ইহার কারণ এই জলীয় বাষ্প। শীতকালে হাই তুলিলে ধোঁয়ার মত যাহা বাহির হইয়া আসে তাহাও নিশ্বাসনির্গত জলীয় বাষ্প ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বায়ুতে অন্যান্য দ্রব্য।—আমাদের পরিত্যক্ত শ্বাস বায়ুতে কিয়ৎ পরিমাণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মৃত কণিকা ও দূষিত গ্যাস পাওয়া যায়। তাহাতে বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে এবং এগুলির বিকৃতি ও পচন ঘটিলে সেই বায়ুতে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। আমোনিয়া, ইউরিয়া ইত্যাদি দ্রব্যও বায়ুতে অল্প পরিমাণে থাকে। জনাকীর্ণ স্থানে বায়ুর প্রবাহ বন্ধ থাকিলে শীঘ্রই সেখানকার বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে এবং একটা দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। উহা পূর্বোক্ত জৈব পদার্থ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। নানাপ্রকারে এই জৈব পদার্থ বাতাসে আসিয়া পড়ে।

দূষিত বায়ু।—যেখানে মৃত জীবজন্তু, পাট লতাপাতা, মলমূত্র, আবর্জনাদি পড়িয়া পচে সেখানে অধিক পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস জন্মে এবং বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে। জনাকীর্ণ স্থানে বহু-লোকের পরিত্যক্ত নিশ্বাসের ফলে বায়ুর বিশুদ্ধতা সহজেই নষ্ট হয়। তেমনি সংকীর্ণ ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বাস করিলে বায়ু কলুষিত হইয়া পড়ে। আবদ্ধ স্থানে আগুন জ্বালিলে বা ধোঁয়া হইলেও বায়ু বিষাক্ত হয়। এইরূপে নানা কারণে বায়ুর বিশুদ্ধতা প্রতি মুহূর্তে নষ্ট হইতেছে। ১০,০০০ ভাগ বায়ুতে ৬ ভাগের অধিক কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস থাকিলে তাহাকে দূষিত বায়ুরূপে গণ্য করা যায়।

বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা।—পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেনের জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন। দূষিত বায়ুতে উহার ভাগ কম থাকে। নিশ্বাসের বায়ু যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ ও প্রবহমান হওয়া আবশ্যক। সমুদ্র বা নদীর তীরে, পর্বতের উপর ও পল্লীগ্রামে উন্মুক্ত মাঠের বায়ু নির্মল। দেহ মন যতই অবসন্ন হউক, উন্মুক্ত

স্থানের বিশুদ্ধ বায়ু কিছুক্ষণ সেবন করিলে আমরা যে স্ফূর্তি বোধ করি তাহাতে সন্দেহ নাই। তেমনি দুর্গন্ধপূর্ণ রুদ্ধ বায়ুতে কিছুক্ষণ থাকিলেই দেহ ও মন ভাঙিয়া পড়ে। দূষিত বায়ুতে বাস করিলে দেহ পীড়িত হয়; বিশুদ্ধ বায়ুতে বাস করিলে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল থাকে এবং দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। অতএব সর্বদা প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে যত্নবান হইবে এবং দরজা জানালা ইত্যাদি বন্ধ রাখার নিন্দনীয় প্রথা বর্জন করিবে। রাত্রে ঘরের সমুদয় বায়ুপথ বন্ধ করিবে না, এমন কি শীতকালেও না। শীতে মাথা অবধি লেপ কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমান অতি অনিষ্টকর, কারণ তাহার ফলে গায়ের ঢাকার ভিতর বায়ু দূষিত হইয়া উঠে এবং সেই দূষিত বায়ু বার বার টানিয়া লইয়া দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে।

রোগীর ঘরে মুক্ত বায়ুর বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে অনেকে রোগীর ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া বিশেষ অনিষ্ট করে। রোগীর ঘরে আবার যদি আগুন রাখা হয়, অথবা কোন কারণে ধোঁয়া জমে, তখন অবস্থা আরও বিপজ্জনক হইয়া পড়ে।

(২) বায়ুর ময়লায় বিপদ

বায়ুতে পূর্বোক্ত দ্রব্যগুলি ব্যতীত নানাপ্রকারের ময়লা পাওয়া যায় এবং সময়ে সময়ে তাহা হইতে আমাদের বিপদ আসিয়া পড়ে। প্রাণিগণের ফুসফুস, লোমকূপ ও শরীরের অন্যান্য যন্ত্র হইতে ত্যক্ত পদার্থ নির্গত হইয়া অবিরত বায়ুতে মিশিতেছে। কাঠ বা কয়লা, গ্যাসের আলোক, তৈলের প্রদীপ ও বাতি প্রজ্বলিত হইবার সময় বায়ু হইতে অক্সিজেন আকর্ষণ করে ও তাহাতে কার্বনিক অ্যাসিড

গ্যাস, জলীয় বাষ্প, অঙ্গার কণা এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ বাড়াইয়া দেয়। রাস্তার পচা ময়লা হইতে বহির্গত কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস এবং নানাবিধ দুর্গন্ধযুক্ত অনিষ্টকর বাষ্প এবং ড্রেন, নর্দমা, পচা ময়লা জলের গর্ত্ত, পায়খানা, আস্তাবল, গোয়ালঘর, বহুলোকের কবরযুক্ত এবং অযত্নরক্ষিক গোরস্থান কিংবা মৃত জন্তু ফেলিবার জায়গা (ভাগাড়), ইটখোলা, জলাজমি ও কল-কারখানা প্রভৃতি হইতে সর্বদা বহির্গত দুর্গন্ধযুক্ত অনিষ্টকর বাষ্পও বায়ুকে দূষিত করে। বায়ুর সঙ্গে মানুষের চুল, চর্মের কণা, জন্তুর লোম, মলিন বস্ত্রের সুতা, গাছপাতার গুড়া, পরিত্যক্ত থুথু, শ্লেষ্মা, মলমূত্র, আবর্জনা প্রভৃতির কণা মিশিয়া উহাকে দূষিত করে।

ধূলিকণার সংমিশ্রণেও বায়ু দূষিত হয় এবং সেই ধূলির সহিত অনেক সময় নানাবিধ রোগের বীজ নিহিত থাকে। বায়ু হইতে ধূলিকণা সহজেই আমাদের সংস্পর্শে আসে। এই-রূপে ব্যাধির জীবাণু অনেক সময় আমাদের দেহে সংক্রামিত হয়। বাস্তবিক যে বায়ু আমাদের জীবনস্বরূপ, সেই বায়ুই ধূলা ময়লা দ্বারা দূষিত হইলে আমাদের মৃত্যুর কারণ হইয়া পড়ে।

শ্বাসবায়ুর সহিত বায়ুর ধূলি আমাদের নাসিকায় প্রবেশ করে। উহার কতক নাসিকার মধ্যস্থিত রোমাবলীতে বা ত্বকে লাগিয়া যায় এবং কতক বায়ু-পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। জনাকীর্ণ স্থানে আঙুলে কাপড় জড়াইয়া নাকের ভিতর মুছিলে কাপড়ে এই ময়লা লাগিতে দেখা যায়।

কোন সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করিলে সেখানকার বায়ুতে রোগের জীবাণু প্রভূত পরিমাণে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহা বায়ুর

সহিত সুস্থদেহে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপন্ন করে। বসন্তরোগীর দেহের ঘায়ের অসংখ্য জীবাণুপূর্ণ শুষ্ক মড়মড়ির কণাগুলি বাতাসের সাহায্যে সহজেই চতুর্দিকে ছড়াইয়া যায়, এবং সেজন্য বসন্তের প্রসার নিবারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যক্ষ্মারোগী নিয়ত যে থুথু, শ্লেষ্মা, কফ ফেলে তাহাতে অসংখ্য জীবাণু থাকে এবং তাহা শুকাইয়া ধূলার সহিত বায়ুতে মিশে। তখন সেগুলি আমাদের নাকে মুখে আসিয়া পড়ে ও খাদ্যদ্রব্যাদি বিষাক্ত করিয়া দেয়। ধূলা-বাহিত জীবাণু দ্বারা এইরূপে অনেকে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

বাতাসে ঝড় বহিলে ভূমি হইতে ধূলির সঙ্গে বালুকা প্রভৃতি নানা প্রকার কঠিন পদার্থের কণাও বায়ুর সহিত মিলিয়া আমাদের শ্বাসযন্ত্রাদিতে গিয়া পড়ে। তখন ঐ সকল কঠিন পদার্থের কণা হইতে বিপদ হইতে পারে। সেজন্য ঝড়ের সময় বেশিক্ষণ রাস্তা বা মাঠে থাকিলে আমাদের নাক মুখ বা গলায় প্রদাহের লক্ষণ দেখা যায়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলি কঠিন কণা ফুসফুসের ভিতর গিয়া পড়িলে সেখানে প্রদাহ হইতে পরে। জনাকীর্ণ শহরে বা অপরিষ্কার স্থানে ঝড়ের সময় গৃহের বাহিরে থাকিলে প্রায়ই আমাদের সর্দি হয়, নাক, মুখ, চোখ উত্তপ্ত ও ভারী বোধ হয় এবং গলায় ব্যথা হয়। যাহারা হাঁপানি রোগী তাহাদের উহা হইতে হাঁপের ফিট আসিয়া পড়িতে পারে। অতএব ঝড়ের সময় বাহিরে না থাকাই উচিত। যদি কোন সময়ে ঐরূপ বায়ু-বাহিত ময়লা দ্রব্যকণার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিতে হয় তখন শীঘ্রই নাক, মুখ, গলা ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিবে। লবণ বা তদ্রূপ ঔষধ মিশ্রিত জলের কুল্লি করিলে উপকার হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

(১) দূষিত বায়ুজনিত পীড়া

বায়ুপ্রবাহহীন ঘরের ভিতরে, সভাগৃহে, থিয়েটারে, সিনেমায় কিয়ৎকাল থাকিলে যে লোকের মাথা ধরে, গা বমি বমি করে, তাহা অবিশুদ্ধ বা দূষিত বায়ুর জন্যই যে ঘটে তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐরূপ দূষিত বায়ুতে বাস করিলে বিষণ্ণতা, অবসাদ, অগ্নিমান্দ্য, অনিদ্রা উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে। তখন সহজেই ফুসফুসের সুস্থ ও সবল অবস্থা নষ্ট হইয়া পড়ায় ব্রনকাইটিস, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগ আক্রমণ করে। দূষিত বায়ু হইতে চক্ষুরোগ, হাম, বসন্ত, ডিপথিরিয়া, রক্তাতিসার, প্লেগ ও অন্যান্য বহু ব্যাধির বীজ আসিয়া আমাদের দেহে প্রবেশ করে। যাহাদের জীবিকার্জনের জন্য ঐরূপ দূষিত স্থানে থাকিতে হয় তাহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত ব্যাধিজনিত মৃত্যুসংখ্যা সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক বেশি। রোগের জীবাণুমিশ্রিত ধূলিকণা, পানীয় জল বা দুগ্ধাদির সহিত উদরস্থ হইয়া আন্ত্রিক জ্বর ও রক্তাতিসার প্রভৃতি ব্যাধি উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। পরিষ্কার ও নির্মল বায়ু সঞ্চালিত মুক্তস্থান অপেক্ষা জনাকীর্ণ শহর, নোংরা পল্লীগ্রাম কিংবা অপরিষ্কার গৃহে যে রোগ ও মৃত্যু সংখ্যা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্বাসযন্ত্রাদির পীড়া।—দূষিত বায়ু হইতে আমাদের শ্বাস-

যন্ত্রের পীড়ার যে আধিক্য হয় তাহার প্রধান কারণ, আমরা রোগীর থুথু, শ্লেষ্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রায়ই সাবধানতা অবলম্বন করি না। হাঁচিলে বা কাসিলে নাক বা গলা হইতে যাহা অদৃশ্য আকারে ফোয়ারার মতন ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসে তাহার কণাগুলি, তখন সম্মুখে যে থাকে তাহার মুখে যাইয়া পড়ে, অথবা শ্বাসবায়ুর সহিত ভিতরে চলিয়া যায়। উহা দেওয়ালে বা নিকটস্থ স্থানে পড়িলে শীঘ্র শুকাইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায় এবং ক্রমে ধূলার সহিত আমাদের শ্বাসপথে আসিয়া পড়ে; তখন পীড়ার সৃষ্টি হয়। এইরূপে প্রত্যহ কত শত শত ব্যক্তি যে শ্বাসযন্ত্রের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

সাধারণত মাঝে মাঝে আমাদের যে সর্দি হয়, তাহা নাকের ভিতর ধূলার সহিত কতকগুলি জীবাণু প্রবেশ করাতে উৎপন্ন হয়। জনাকীর্ণ ও অপরিষ্কার স্থানে বাস করিলে প্রায়ই এই কারণে সর্দি হয়। রোগের জীবাণু বায়ুস্থিত ধূলার সহিত গলার ভিতরে প্রবেশ করিয়া ফ্যারিংস, টন্‌সিল প্রভৃতিতে প্রদাহ উৎপন্ন করে। ডিপথিরিয়া ব্যাধিও এইরূপে হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক ব্যাধির জীবাণু প্রায়ই নাকের ভিতর দিয়া দেহে প্রবেশ করে। এই সকল রোগের জীবাণু অতীব সংক্রামক এবং রোগীর হাঁচি ও কাসির সহিত বাহির হইয়া শীঘ্র চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে। যে ভয়ঙ্কর নিউমোনিয়া (pneumonia) ব্যাধি ফুসফুস আক্রমণ করিয়া বহু লোকের মৃত্যু ঘটায় তাহাও জীবাণু হইতে উৎপন্ন। এই জীবাণু বায়ুপথে প্রবেশ করিয়া ফুসফুসে যাইয়া তাহার ভিতর প্রদাহ উৎপন্ন করে।

যে যক্ষ্মারোগ বা থাইসিস্ (phthisis) আজকাল আমাদের দেশে সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও প্রায়ই শ্বাসযন্ত্রে প্রথম উৎপন্ন হয়। ক্রমে ক্রমে উহার জীবাণুগুলি বিস্তার লাভ করিয়া ফুসফুসকে একেবারে অকর্মণ্য করিয়া ফেলে। যক্ষ্মারোগের জীবাণু রোগীর কফ্ শ্লেষ্মা হইতে ধূলার সহিত বায়ুপথের ভিতর দিয়া অন্য ব্যক্তির ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপন্ন করে।

ঠাণ্ডা লাগায় শ্বাসযন্ত্রের পীড়া হইবার কথা অনেকের মুখে শুনা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, জীবাণুঘটিত রোগের উৎপাদনে ঠাণ্ডার উপর সকল দোষ চাপান যায় না। ঠাণ্ডায় দেহের অবসাদ আসিয়া পড়িলে তখন সামান্য কারণে পীড়া জন্মিতে পারে, কিন্তু রোগের জীবাণুর সহিত সংস্পর্শ না হইলে জীবাণু-ঘটিত ব্যাধি উৎপন্ন হয় না। রোগের জীবাণু রোগীর দেহ হইতেই আসে। শীতের সময় গাত্রে উপযুক্ত আচ্ছাদন না দিয়া বাহিরে থাকিলে ঠাণ্ডায় দেহ কাতর ও অবসন্ন হয় এবং তখন দেহে জীবাণু সংক্রামিত হইলে সহজেই রোগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু গলায় মোটা গলবন্ধ বাঁধিয়া ও গায়ে কম্বল বা লেপ জড়াইয়া ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও, যদি দূষিত বায়ুস্থিত রোগের জীবাণুর সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হয়, তাহা হইলে রোগ হইতে নিস্তার পাওয়া কঠিন।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।—যদি শ্বাস গ্রহণের বায়ু এমন অতিরিক্ত পরিমাণে দূষিত হইয়া পড়ে যে তাহা হইতে আমাদের দেহের ভিতর আবশ্যক পরিমাণ অক্সিজেন মিলে না, তখন সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের চেষ্টা প্রবল

হইয়া পড়ে এবং ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে থাকে। যদি ঘন ঘন নিশ্বাস টানিয়াও অক্সিজেনের অভাব না মিটে, তাহা হইলে শীঘ্রই রক্তে কার্বনিক অ্যাসিড অধিক জমিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেনের পরিমাণ আরও কম হইয়া যায়। তখন নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় এবং শরীর অস্থির হইয়া পড়ে, দেহ নীলাভ হয়, চোখ বাহির হইয়া পড়ে ও চোখের মণি প্রসারিত হয় এবং ধমনীগুলি স্ফীত হইয়া উঠে। ইহার পর বক্ষঃস্থলের মাংসপেশীর আক্ষেপ ও বিক্ষেপ (convulsion) উপস্থিত হয়। ইহাতে শীঘ্রই চৈতন্য বিলুপ্ত হয় এবং শেষে মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে।

(২) দূষিত বায়ুর প্রতিবিধান

দূষিত বায়ু ঘটিত পীড়ার প্রতিবিধানার্থ উপায় করা যেমন সহজ তেমনি আবার কঠিন। স্বাভাবিক নিয়মে দূষিত বায়ু কিরূপে চারিদিকের উন্মুক্ত বায়ুর সহিত মিশিয়া বিশুদ্ধ হয় তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। অতি অল্প আয়াসে তাহা সম্পন্ন হয়। পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে সর্বদা উন্মুক্ত বায়ুতে বাস করিলে দূষিত বায়ুর ভয় চলিয়া যায় ; কিন্তু কার্যকালে তাহা সকল সময়ে করিয়া উঠা যায় না। অনেকের জীবিকার জন্য অপরিষ্কার আবদ্ধস্থানে দিবসের প্রধান অংশ কাটাইতে হয়। আজকাল বড় বড় কল কারখানা, খনি ইত্যাদিতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা নিবারণের জন্য নানাপ্রকার আইন ও নিয়মাদি প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে দূষিত বায়ুর বিপদ চলিয়া গিয়াছে বলা যায় না।

সমাজে বাস করিতে হইলে লোকসমাগমের মধ্যে যাইতে হয় এবং জনাকীর্ণ বাজার হাট ইত্যাদি স্থান একেবারে বর্জন করা যায় না। আত্মীয় বন্ধুর রোগে তাহাদের একেবারে পরিত্যাগ করাও সম্ভব হয় না। সম্যক্ বায়ুপ্রবাহহীন সভাগৃহে, থিয়েটার সিনেমা ইত্যাদি স্থানগুলিতে কখন কখন যাইতেই হয়। যাহা হউক, সকলেরই কর্তব্য যতদূর সাধ্য দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত বায়ুতে বাস করা। জীবিকার জন্য অস্বাস্থ্যকর খনি বা কল কারখানায় নিযুক্ত না হইয়া উন্মুক্ত স্থানে অপেক্ষাকৃত কম মাহিনায় কাজ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।

রোগের জীবাণু যেখানে থাকার সম্ভাবনা সেরূপ স্থান পরিত্যাগ করিবে। রোগীর থুথু, কফ্, শ্লেষ্মা আমাদের নাক বা মুখে আসিয়া পড়িতে পারে একথা স্মরণ রাখিয়া রোগীর সংস্পর্শ যথাসাধ্য পরিহার করিবে এবং তাহার সহিত মেলামেশা করিবে না। রোগীর কাছে যাওয়ার নিতান্ত দরকার হইলে যাহাতে তাহার হাঁচি বা কাসি হইতে বিক্ষিপ্ত কণাগুলি তোমাদের নাকে, মুখে বা গায়ে না লাগে সেজন্য সাবধান হইবে। রোগীর হাঁচিবার বা কাসিবার সময় যাহাতে অন্যের গায়ে থুথু বা কফ্ না লাগে সেজন্য কাপড় বা অন্য কিছুর আড়াল দেওয়া উচিত। রোগীর যেখানে সেখানে থুথু ফেলা নিবারণ করিবে। পিকদানিতে বিশোধক দ্রব্য ঢালিয়া তাহার মধ্যে রোগীকে থুথু ফেলিতে দিবে এবং শীঘ্র তাহা পরিষ্কার করাইবে।

অধুনা চতুর্দিকে সবাক্ চলচ্চিত্র দেখাইবার জন্য সিনেমা ও টকি-হাউস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ক্রমেই বাড়িতেছে।

এগুলির মধ্যে প্রায়ই বাহিরের আলোক ও শব্দ বন্ধ করার জন্য সব দরজা জানালা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বহু ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থার অভাবে তখন দর্শকদের দূষিত বায়ুর মধ্যে বসিয়াই ছবি দেখিতে হয়। বিনা বাধায় অনেকে সেথায় থুতু, কফ্ ও শ্লেষ্মা ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে বিড়ি সিগারেটের ধূমে ঘরটি দূষিত হইয়া উঠে। যাহারা এরূপ স্থানে প্রায়ই যান তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা একথা স্মরণ রাখা উচিত।

(৩) বায়ু সঞ্চরণ

বায়ুপ্রবাহ।—বায়ুতে সর্বদাই একটি প্রবাহ আছে। বায়ুর একটি গুণ এই যে, উহা উত্তপ্ত হইলে লঘু ও প্রসার প্রাপ্ত হয়। নানাকারণে পৃথিবীর উপর যে দহন-ক্রিয়া চলিতেছে তাহার ফলে উত্তাপ উৎপন্ন হওয়ায়, ভূপৃষ্ঠের বায়ু লঘু হইয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়। উত্তপ্ত বায়ু ঊর্ধ্বে উঠিলেই শীতল বায়ু তাহার স্থান পূর্ণ করে। এইরূপে যে প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাহার ফলে কোন স্থানের বায়ু দূষিত হইলে শীঘ্রই তাহা দূরীকৃত হয় এবং বিশুদ্ধ বায়ু আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করে।

বায়ু সঞ্চরণ।—ঘরের বায়ু কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশিয়া দূষিত হইলে জানালা, দরজা ও অন্যান্য পথ দিয়া বাহির হইয়া যায়, এবং বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু তখন ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহার স্থান অধিকার করে। ইহাকেই বায়ু সঞ্চরণ বা ভেন্‌টিলেশন (ventilation) বলে। চিমনি

হইতে ধূম নির্গত হইয়া যেমন চতুর্দিকের হাওয়ায় মিশিয়া শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া পড়ে, তেমনি গৃহের দূষিত বায়ুও বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত শীঘ্রই মিশিয়া যায়। বায়ুস্থিত নানাপ্রকার বাষ্প প্রভৃতি শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে, এবং সেই সঙ্গে উত্তপ্ত বায়ু উপরে উঠিয়া যায় ও শীতল বায়ু আসিয়া সে স্থান অধিকার করে। বায়ুর প্রবাহ প্রবল থাকিলে অতি শীঘ্রই গৃহের ভিতরস্থ দূষিত বায়ু ও উহার পচনশীল পদার্থাদি দূর হইয়া যায় এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে সেস্থান পূর্ণ হয়।

বায়ু সঞ্চরণের আবশ্যকতা।—বিশুদ্ধ বায়ু ব্যতীত আমাদের সুস্থভাবে জীবনধারণ অসম্ভব। বায়ু হইতে অক্সিজেন লইয়া আমরা বাঁচিয়া থাকি এবং ইহার অভাব হইলে মৃত্যু অনিবার্য। কোন সীমাবদ্ধ স্থানে বায়ুর অক্সিজেন ফুরাইয়া গেলে, অথবা অত্যন্ত কমিয়া গেলে আমাদের শ্বাসক্রিয়া কষ্টকর হইয়া পড়ে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস বাহির হয় তাহা অতিশয় অপকারী এবং আবদ্ধ স্থানে শীঘ্রই উহার আধিক্য হইয়া থাকে। সুতরাং বাহির হইতে অক্সিজেনপূর্ণ বিশুদ্ধ বায়ু বাসগৃহের ভিতর আনিতে, এবং কার্বনিক অ্যাসিড-পূর্ণ দূষিত বায়ু ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিতে, বায়ু সঞ্চরণ অতীব প্রয়োজনীয়।

গৃহের আবদ্ধ বায়ু।—চারিদিক বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে বাস করিলে শীঘ্রই বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে। বায়ু চলাচল না থাকায় বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ভিতরে আসে না এবং তখন দূষিত বায়ুতেই শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পন্ন করিতে হয়। এইরূপ দূষিত বায়ুতে বাস

করিলে শীঘ্রই জীবনীশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বায়ু অতিরিক্ত দূষিত হইলে তাহাতে মৃত্যু অবধি ঘটিতে পারে। অতএব বাসগৃহে যাহাতে সম্যক্ বায়ু চলাচল হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঘরের সমস্ত বায়ুপথ একেবারে রুদ্ধ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক তাহা স্মরণ রাখিবে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে অনেকে ছেলেমেয়েদিগকে সারাদিন ঘরে বন্ধ করিয়া রাখে; ফলে শিশুরা দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। গায়ে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি থাকিলে ঠাণ্ডা লাগিবার বিশেষ ভয় নাই। সুস্থ দেহে শীতকালেও লেপ বা কম্বলে দেহ ঢাকিয়া জানালা খুলিয়া শোয়া যায়।

অগ্নি ও বায়ু।—জীবজন্তুর শ্বাসপ্রশ্বাসে যেমন বায়ু দূষিত হয়, তেমনি ঘরে প্রদীপ ও আগুন জ্বালিলে বায়ুর অক্সিজেন খরচ হইয়া যায় এবং কার্বনিক অ্যাসিড বৃদ্ধি পায়। সেজন্য ঘরের ভিতর দীপ বা আগুন জ্বালিলে, বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের পথ রাখা আবশ্যক। শীতকালেও সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখা উচিত নহে। চারিদিকে আঁটাসাঁটা আঁতুড়ঘরের ভিতর আগুন জ্বালিয়া রাখায় বায়ু দূষিত হইয়া নিদ্রিত ব্যক্তিদের মৃত্যু হইয়াছে এমন ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। অক্সিজেনের অভাব এবং কার্বন-মনক্সাইড (carbon-monoxide) নামক বিষ-গ্যাসের উদ্ভবই এইরূপ মৃত্যুর কারণ।

বায়ু সঞ্চালনের উপায়।—বাসগৃহের বায়ু সহজেই দূষিত হয়, কিন্তু সেজন্য গৃহ পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। অতএব যাহাতে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু সর্বদা ঘরের দূষিত বায়ুকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয় এবং সেইস্থান বিশুদ্ধ বায়ুতে পূর্ণ হয় তাহার

ব্যবস্থা করা• দরকার। ইহার সহজ উপায়, ঘরে সম্যক্ দরজা জানালা বসান ও সেইগুলি প্রায় সকল সময় খোলা রাখা। ঘরে পাখা চলিলেও দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায়।

শীতপ্রধান দেশে বায়ু সঞ্চরণের জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। বাংলার ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐ সকলের বেশি প্রয়োজন হয় না এবং উহাদের প্রয়োগও ব্যয়সাপেক্ষ। যদি আমরা ঘরের দেওয়ালে সাম্‌না-সাম্‌নি ভাবে জানালা বসাই, তাহাতেই বায়ু চলাচলের পথ প্রশস্ত হইয়া যায় এবং সেগুলি একসঙ্গে বন্ধ না করিলে বায়ু সঞ্চরণের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা দরকার হয় না। খোলার বা খড়-পাতার ঘরের চারিদিকে যে সকল ছিদ্র থাকে তাহাতে বায়ু সঞ্চরণের সাহায্য হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐরূপ ঘরেও জানালার ব্যবস্থা করা উচিত। পাকা ঘরের ছাদের ঠিক নীচে কড়ির পার্শ্বের গাঁথনিতে ক্ষুদ্রাকারে বায়ুপথ (ventilator) রাখার ব্যবস্থা বেশ ভাল।

দরজা জানালা।—বায়ু সঞ্চরণের জন্য প্রত্যেক ঘরে দরজা জানালা বসান আবশ্যক। এগুলি এমন ভাবে বসাইতে হইবে, যেন সহজে বায়ু প্রবেশ করিতে ও বাহির হইয়া যাইতে পারে। ঘরের মাত্র এক দিকে সেগুলি থাকিলে তেমন বায়ু সঞ্চরণ হয় না। অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙালীর চক্‌মিলান বাটীতে ঘরগুলি উঠানের দিকে খোলা থাকিলেও পশ্চাৎদিকে প্রায় একেবারে বন্ধ। ঐরূপ ঘরে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয় না। সেজন্য সাম্‌না-সাম্‌নি দরজা জানালা বসান উচিত।

দরজা জানালাগুলি দিনে ও রাত্রে যতক্ষণ সম্ভব খোলা

রাখিবে; বন্ধ করিয়া রাখিলে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব হইয়া পড়িবে। রোগীর ঘরে যাহাতে নিয়ত বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চরণ হয় তাহার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ঠাণ্ডার ভয়ে রোগীর ঘরের দরজা জানালা একেবারে বন্ধ করিয়া রাখা অনুচিত। রোগীর ঘরে বহুলোক একত্র হইলে শীঘ্রই সে ঘরের বায়ু আরও দূষিত হইয়া পড়ে।

শয়নগৃহে বায়ু সঞ্চরণ।—আমরা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকি, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সময় শয়নগৃহে কাটাই। অতএব আমাদের শয়নগৃহে পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু সঞ্চরণের ব্যবস্থা করা উচিত। যতক্ষণ সম্ভব শয়নগৃহের দরজা জানালগুলি খোলা রাখিবে এবং কখনও, এমন কি শীতকালেও, সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিবে না। মনে রাখিবে, বন্ধ ঘরের অবিশুদ্ধ বায়ু শ্বাসক্রিয়ায় পুনঃপুন ব্যবহার করায় শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং সেরূপ ঘরে ঘুমাইলে দেহের শ্রান্তি দূর না হইয়া বরং অসুখ হয়।

বায়ু কিরূপে বিশুদ্ধ হয়।—প্রকৃতির মঙ্গলময় বিধানে দূষিত বায়ু সহজেই বিশুদ্ধ হইয়া যায়। সূর্যের কিরণে বায়ুস্থিত জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়। বায়ু হইতে প্রাণিগণ অক্সিজেন লয় ও তাহাতে কার্বনিক অ্যাসিড পরিত্যাগ করে; উদ্ভিদেরা কার্বনিক অ্যাসিড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। জীবজন্তু যাহা পরিত্যাগ করে, বৃক্ষাদি উদ্ভিজেরা তাহাই সূর্য-কিরণের সাহায্যে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। এতদ্ব্যতীত বৃষ্টি হইলে বায়ুতে ভাসমান নানাপ্রকার ধূলা, ধূম, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থের কণা জলের সঙ্গে ভূমিতে পড়িয়া যায়।

সূর্যকিরণে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলে উহার নিকটস্থ বায়ুও উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং সেই উত্তপ্ত বায়ু পাতলা ও লঘু হইয়া পড়ে। তখন উহা ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শীতল বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। অতএব বায়ু যেমন নানা কারণে দূষিত হইয়া পড়ে, তেমনি আবার প্রাকৃতিক নিয়মে নানা উপায়ে উহা শীঘ্রই বিশুদ্ধ হইয়া যায়।

ঘরের লোকসংখ্যা।—ঘরের ভিতরের বায়ু সদা বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে উহার অধিবাসীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা একত্র গুণ করিয়া যত ঘনফুট হয়, গড়ে জনপ্রতি তাহার ছয় শত ফুট করিয়া রাখা উচিত। ঘরটি ১০ ফুট লম্বা ১০ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উঁচু হইলে উহার কালি ১০০০ ঘনফুট হইবে; ঘণ্টায় তিনবার করিয়া ঐ ঘরে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিয়া দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দিলে, মোট ৩০০০ ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যাইবে। দেখা গিয়াছে একজনের শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘণ্টায় প্রায় ঐ পরিমাণ বায়ুর বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া যায়। অতএব ঐ ঘরে একজন মাত্র লোকের বাসই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঐ ঘরে ঘণ্টায় তিন বারেরও অধিক বায়ু বদল হইতে পারে; সেজন্য জনপ্রতি আন্দাজ পাঁচ শত ঘনফুট স্থান ধার্য করা যাইতে পারে।

দুঃখের বিষয় এইরূপ ব্যবস্থা প্রায়ই করা হয় না, এবং জনাকীর্ণ শহরে দরিদ্র পরিবারে এক ঘরে বহুলোক বাস করায় কখন কখন জনপ্রতি ৭০।৭৫ ঘনফুট স্থানও মিলে না। এই কারণে সহস্র সহস্র ব্যক্তি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অনেক পর্দানশিন মহিলারা দিবারাত্র অপ্রশস্ত স্থানের দূষিত বায়ুতে বাস করিয়া চিররুগ্না হইয়া পড়েন।

গৃহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করিয়া উহার মেঝের যে বর্গ মাপ মিলে, তাহার অনুপাতে ঘরের অধিবাসীর সংখ্যা স্থির করা উচিত, এবং জনপ্রতি ৮০ বর্গফুট স্থান রাখা উচিত। কিন্তু ঐ পরিমাণ মেঝের স্থান সর্বত্র পাওয়া কঠিন। বিশেষত যেখানে বহুলোক একত্র হয়, যেমন থিয়েটার, সভাগৃহ, বিদ্যালয়, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, কারখানা ইত্যাদিতে, অত স্থান পাওয়া অসম্ভব। সেজন্য এই সকল স্থানে যাহাতে বার বার বায়ু বদল হইয়া যায় এবং সম্যক্ বায়ু প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দরকার।

সারারাত্রি দরজা জানালা খুলিয়া শয়ন করিবার অভ্যাস অতি উত্তম। হাসপাতালে রোগীদের বার মাস দরজা জানালা খুলিয়া ঘুমাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে উপকার ছাড়া অপকার হয় না। গায়ে আবশ্যকমত বস্ত্রাদি থাকিলে ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকে না।

চতুর্থ অধ্যায়

পেশী চালনা, ব্যায়াম ও অঙ্গসংস্থান

মাংসপেশী।—এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে মাংসপেশী বর্ণনা-কালে আমরা উহাদের কার্যপ্রণালী, গঠন ইত্যাদির বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে কিভাবে সকলের অঙ্গচালনা ও অঙ্গসংস্থান করা উচিত তাহাই আমরা বলিব।

অঙ্গচালনা।—আমাদের দেহে মাংসপেশীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। সর্বপ্রকার অঙ্গচালনাই ঐ পেশীগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয়। মাংসপেশীর স্বাভাবিক ধর্ম কতকটা দৃঢ়ভাবে অবস্থান করা। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, দেহের মধ্যে ঐ পেশীগুলি অতি কৌশলের সহিত সাজান আছে। কতকগুলি পেশী পরস্পরকে সাহায্য করে, আবার কোথায়ও বা একশ্রেণীর পেশী-গুলির ক্রিয়াধিক্য নিবারণ করিবার জন্য অন্য এক শ্রেণীর পেশীগুলি উহাদিগকে বিপরীত দিকে টানে। আমরা দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় আমাদের পশ্চাতের পেশীগুলি যখন সংকুচিত হইয়া টানে, তখন পেটের ও কোমরের কতকগুলি পেশী সেই সঙ্গে সংকুচিত হইয়া অন্য দিকে টান দিতে থাকে। ঐ দুই শ্রেণীর পেশীগুলির টানাটানির ফলে আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হই।

শৈশবে একদিকের পেশীগুলি অপরদিকের পেশীগুলির ক্রিয়াধিক্য রোধ করিতে না পারায়, শিশুরা কোন দিকে ঝুঁকিলেই পড়িয়া যায়। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পেশীগুলির

ক্রিয়ার ভিতর একটা সামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে এবং তখন পেশীগুলি যথাযথ খাটাইয়া শিশুরা বসিতে ও দাঁড়াইতে পারে।

মাংসপেশীগুলিকে নিয়মিতভাবে উহাদের স্বাভাবিক কার্যে নিয়োগ করিলে, অঙ্গাদি চালনার সুবন্দোবস্ত হয় এবং তাহাতেই পেশীগুলি সুস্থ থাকে। তখন এই পেশীগুলির ক্রিয়া এমন স্বচ্ছন্দভাবে সম্পাদিত হয় যে, উহাদের সংকোচন বা প্রসারণে কোনরূপ কষ্ট অনুভূত হয় না। বানর, হরিণ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি বন্য পশুরা যখন লম্বা লম্বা লাফ দেয়, তখন পেশীর সাহায্যেই তাহারা ঐরূপ কার্যে সক্ষম হয়। বাস্তবিক তাহাদের পেশীগুলি ঐরূপ কার্যের জন্যই প্রস্তুত। আবশ্যক না হওয়ায় এবং আমাদের অভ্যাস না থাকায়, আমাদের পেশীগুলি এরূপ লাফ দেওয়ার কার্য করিতে পারে না। কিন্তু মানবেরও নিত্য অভ্যাস দ্বারা কতদূর অথবা কত উচ্চ অবধি লাফ দিবার ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয়, তাহা সার্কস ইত্যাদিতে তোমরা দেখিয়া থাকিবে। অভ্যাস করিলে পেশীর সাহায্যে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করা যায়।

যাহারা নৃত্যকলায় সুদক্ষ তাহারা নৃত্যকালে কতপ্রকার বিভিন্ন ভঙ্গীতে অঙ্গাদি চালিত করে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। অনেক সময় তাহারা যেভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চালনা করে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মনোযোগের সহিত আয়াস সহকারে অভ্যাস করিলে মাংসপেশীর কার্যক্ষমতা অনেক বাড়ান যায় সন্দেহ নাই।

ব্যায়াম।—দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম আবশ্যক। ইহার সাহায্যে দেহ সুগঠিত ও মাংসপেশী-গুলিকে পরিপুষ্ট করা যায়। প্রত্যহ কিয়ৎ পরিমাণ ব্যায়াম করা

সকলেরই আবশ্যক। ইহার সম্পূর্ণ অভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা করা কঠিন। মাংসপেশীগুলি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পুষ্ট ও সবল করিতে হইলে তাহাদের চালনা করা দরকার। যে অঙ্গটি সমধিক চালনা করা হয় সেইটিই বিশেষ পরিপুষ্ট ও কার্যক্ষম হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যায়ামশীল বাঙালী যুবকদের মধ্যেও মাংসপেশীর বিশেষ পুষ্টির উদাহরণ আজকাল দেখা যায়। পালোয়ানদের মধ্যে মাংসপেশীর অসাধারণ বৃদ্ধি ও পুষ্টি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, স্বাস্থ্যের জন্য অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক পেশীবৃদ্ধির আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যাহাতে দেহের প্রত্যেক পেশী সম্যক্ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, নিজ নিজ কার্যের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে, এবং সহজে ও স্বচ্ছন্দে সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ব্যায়ামকালে ফুসফুসের ভিতর রক্ত সবেগে প্রবেশ করে ও ঘন ঘন শ্বাসের সহিত অধিক পরিমাণে অক্সিজেন রক্তের ভিতর সঞ্চারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণ কার্বনিক অ্যাসিড বাহির হইয়া যায়। জলীয় বাষ্পও অধিক পরিমাণে বহির্গত হয় এবং ঘর্মের সহিত নানা দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। ইহার ফলে ফুসফুসের ও হৃৎপিণ্ডের ভিতর রক্ত চলাচলের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, রক্ত পরিষ্কৃত হয়, এবং ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়। প্রত্যহ পরিমিত ব্যায়ামে দেহ সুস্থ, সবল ও নীরোগ হয়, মন প্রফুল্ল থাকে, মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্র কোন ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না।

ব্যায়াম নানা প্রকারের হইতে পারে। যাহার যেটি সুবিধা-জনক বা উপযোগী তাহা স্থির করিয়া লইবে। যে ব্যায়ামে

দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালিত হয় তাহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যায়াম। সকালে ও সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য মুক্তস্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করিলে দেহের ব্যায়ামের কার্য সম্পন্ন হইতে পারে।

প্রত্যহই নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত কিন্তু ব্যায়ামের মাত্রা অতিরিক্ত হইলে দেহের ক্ষতি হইতে পারে। বাহাত্নরি দেখাইবার জন্য অতিরিক্ত ব্যায়াম বা কষ্টকর ও বিপজ্জনক ব্যায়ামাদি সমর্থন করা যায় না। অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়; অতএব উৎকট ব্যায়ামাদির দিকে প্রলুব্ধ হইবে না। ক্লান্ত বোধ হইলে, গায়ে বেশি ঘাম হইলে অথবা শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি খুব দ্রুত হইলে ব্যায়াম বন্ধ করা উচিত।

ব্যায়াম সম্বন্ধীয় কথাগুলি এই পুস্তকের প্রথম ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে; তাহা পড়িয়া দেখ।

অঙ্গসংস্থান।—দেহের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যের হানিকর কতক-গুলি বদভ্যাস আমাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। প্রথম হইতে সাবধানতা অবলম্বন করিলে সেগুলি নিবারিত হইতে পারে। সংক্ষেপে সেগুলি আমরা বলিতেছি।

কতকগুলি মাংসপেশীর কার্যের উপর আমাদের বসা ও দাঁড়ান নির্ভর করে। যে পেশীর যে কার্য তাহা যথোপযুক্ত ভাবে সম্পন্ন না হইলে উহার ক্ষতি হয়, এবং ক্রমাগত বাধা পাইয়া পেশীগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে শরীরের বিকৃতি ঘটে এবং দেহের শ্রী ও সৌষ্ঠব নষ্ট হইয়া যায়। অনেকে এমন ভাবে বসে ও দাঁড়ায় যে, পৃষ্ঠের পেশীগুলি সর্বতোভাবে শিথিল হইয়া থাকে। নিয়ত কুঁজো হইয়া থাকিলে পশ্চাতের পেশীগুলি

অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া এমন হইয়া পড়ে যে, কিছুকাল পরে তাহারা আর দেহকে সোজা করিয়া রাখিতে সক্ষম হয় না।

দাঁড়াইবার নিয়ম।—দাঁড়াইবার সময় দেহ ঠিক সোজা করিয়া রাখিবে। দুই পায়ের উপর ভর দিয়া মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া এবং বক্ষঃস্থল উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে। সম্মুখে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলে মেরুদণ্ড বাঁকা হইয়া যায় এবং ক্রমে উহা অভ্যাসে পরিণত হইলে, মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা বদলাইয়া যায়। কিভাবে দাঁড়ান উচিত এবং তাহা না করিলে মেরুদণ্ড কিরূপ বাঁকিয়া যায়, পার্শ্বের চিত্রে তাহা দেখান হইয়াছে। দুই পায়ের উপর সমানভাবে দেহের ভার ফেলিয়া না দাঁড়াইলে পায়ের অস্থি বাঁকিয়া যায়। পা বেশি ফাঁক করিয়া দাঁড়াইলে বা পায়ের পাতা ভিতর দিকে বাঁকাইয়া রাখিলে ক্রমে স্থানীয় অস্থির ক্ষতি হয়। বুক নীচু করিয়া দাঁড়াইলে বক্ষঃপঞ্জর সংকুচিত হয় এবং অভ্যন্তরস্থ হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস যন্ত্রের নিজ নিজ কার্য সম্পাদনে ব্যাঘাত হয়। কেহ কেহ স্কন্ধদেশ হেলাইয়া দাঁড়ায়; ইহাতেও মেরুদণ্ডের ক্ষতি হয়।
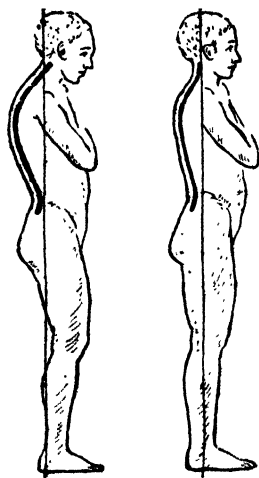
সোজা হইয়া দাঁড়ান

হাঁটিবার নিয়ম।—দুই পায়ের উপর সমানভাবে ভর দিবে এবং দেহ যথাসম্ভব সোজা রাখিয়া হাঁটিবে। ঘাড়, পিঠ, কোমর

অনাবশ্যক বাঁকাইবে না। মনের স্ফূর্তির সহিত বেশ সহজভাবে হাঁটিলে ভ্রমণের ক্লান্তি অনুভূত হয় না।

সরু-মুখ জুতা পায়ে দিয়া আঙুলগুলিকে সর্বদা চাপিয়া রাখিলে সেগুলি বাঁকিয়া যায়। ইহাতে পায়ে স্থানে স্থানে কড়া পড়ে এবং পায়ের গঠন বদলাইয়া যায়। ঐরূপ জুতা কখনও ব্যবহার করিবে না। অতি উচ্চ গোড়ালিযুক্ত জুতা ব্যবহারও উচিত নহে।

বসিবার নিয়ম।—যখন আমরা বসিয়া থাকি বা বিশ্রাম করি, তখন দেহের কোন স্থানে অন্যায় চাপ না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। চলাফেরা ও দাঁড়াইবার দোষে যেমন অঙ্গবিকৃতি জন্মিতে পারে, তেমনি সর্বদা অন্যায় ভাবে বসার অভ্যাস থাকিলেও অঙ্গবিকৃতি জন্মে। বেশ সোজাভাবে বসিবার অভ্যাস করা উচিত। অনেক বালক বইএর উপর অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাঠাভ্যাস করে এবং ইহার ফলে তাহাদের পিঠ কুঁজো হইয়া যায়। তখন মেরুদণ্ড বক্র হয়, মাংসপেশীগুলি দুর্বল হয়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়, মাথা ধরে এবং চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিও কমিয়া যায়। অনেকে শরীর বামে বা দক্ষিণে বাঁকাইয়া বসে; বলা বাহুল্য যে ইহাতেও দেহের ক্ষতি হয়।

টেবিলের সামনে বসিবার সময় চেয়ারে পিঠ ঠেসান দিয়া সোজা হইয়া বসিবে। পড়াশুনা করিবার সময় সেইভাবে বসিতে অভ্যাস করিবে। কিভাবে বসা উচিত তাহা চিত্রে দেখান হইল। চক্ষু হইতে পুস্তক বা খাতার ব্যবধান আন্দাজ ১৮ ইঞ্চি হইবে। তাহাতে চক্ষুর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দেহের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে অতিরিক্ত উঁচু বা নীচু টেবিল ব্যবহার

করিবে না। চেয়ারে বসিলে যেন দুই পা সোজাভাবে মেঝেতে যাইয়া ঠেকে। টেবিলে বই রাখিয়া টুল বা চেয়ারে বসিয়া পড়ার প্রথা অতি উত্তম। ঐরূপ ব্যবস্থার অভাবে, বাক্স, ডেস্ক বা তদনুরূপ দ্রব্যের উপর বই রাখিয়া পড়ার অভ্যাস করিবে। মেঝেয় বসিয়া লিখিতে বা পড়িতে হইলেও বুক সোজা করিয়া রাখিবে, বাঁকিয়া বা ঝুঁকিয়া বসিবে না। মেঝেয় বসিয়া আহার করিলে, "বাবু" হইয়া বসিবে ; "উপু" হইয়া বসিয়া ভোজন করা অন্যায়।
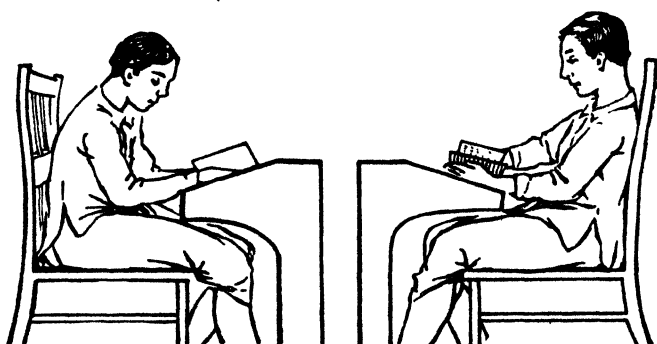
বাঁকা হইয়া বসা সোজা হইয়া বসা

শয়নের নিয়ম।—দেহ কুণ্ডলী পাকাইয়া শয়ন করিবে না ; সটান সোজা হইয়া শয্যায় দেহ এলাইয়া দিবে। সামনে বা পিছনে মস্তক অতিরিক্ত ঝুঁকাইয়া শয়ন করিবে না। অত্যন্ত উঁচু বালিশও ব্যবহার করিবে না। হাতে মাথা রাখিয়া বা উপুড় হইয়া শুইবার অভ্যাস ভাল নয়, ইহাতে রক্ত চলাচলের ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত হইতে পারে। স্প্রিংএর গদি বা দড়ির খাটিয়ায় প্রত্যহ শুইলে মেরুদণ্ডের ক্ষতি হইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

(১) আকস্মিক দুর্ঘটনার চিকিৎসা

আকস্মিক আঘাত।—হঠাৎ দেহে আঘাত লাগিয়া কোনস্থান থেঁত্‌লাইয়া গেলে চর্মের উপরিভাগের কতকটা উঠিয়া যায় এবং শীঘ্র সেস্থান নীলবর্ণ ধারণ করে। যত শীঘ্র সম্ভব স্থানটি বিশুদ্ধ জলে বা ঔষধের লোশনে ধুইয়া টিঞ্চার আইওডিন (Tinct. Iodine) লাগাইয়া দিবে। পরে উহার উপর বোরাসিক (boracic) তূলা চাপা দিয়া বাঁধিয়া দিবে। টিঞ্চার আইওডিন এবং বোরাসিক তূলা অতীব আবশ্যকীয় ঔষধ; ঘরে এগুলি সর্বদা রাখা দরকার।

কোন স্থান হঠাৎ কাটিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা বিশুদ্ধ জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া টিঞ্চার আইওডিন লাগাইয়া দিবে এবং বোরাসিক তূলা ও পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। রক্তপড়া বন্ধ করিবার জন্য আহত বা ক্ষত স্থানে বরফ প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। রক্তপাত অত্যন্ত অধিক হইলে, অথবা ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকিলে, উহা বন্ধ করিবার জন্য ক্ষত স্থানের কিঞ্চিৎ উপরে চাপিয়া ধরিবে, অথবা কিছুক্ষণের জন্য কাপড় দ্বারা আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

হস্ত পদাদিতে পেরেক বা কণ্টকাদি বিদ্ধ হইলে উহা সত্বর বাহির করিয়া ফেলিবে। কাঁটার অগ্রভাগ যেন ভিতরে না থাকে। যত শীঘ্র সম্ভব সেই বিদ্ধ স্থান কার্বলিক কিংবা হাইডার্জ লোশনে

ধুইয়া পরিষ্কার করিবে এবং টিঞ্চার আইওডিন লাগাইয়া দিবে। সময় সময় ধনুষ্টংকার (tetanus) ব্যাধির জীবাণু এই সঙ্গে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পরে ঐ ব্যাধি উৎপাদন করে। সেজন্য তাহার প্রতিষেধক এন্টিটকসিন (antitoxin) পিচকারি দ্বারা দেহের মধ্যে প্রবেশ করান হয়। ইহাতে ধনুষ্টংকার ব্যাধির সম্ভাবনা নষ্ট হয়। চিকিৎসক ইনজেক্‌শনের ব্যবস্থা করিলে তাহা লইতে আপত্তি করিবে না।

গলায় কাঁটা ফোটা।—আহারের সময় হঠাৎ মাছের কাঁটা বা মাংসের ক্ষুদ্র হাড় গলায় বিঁধিলে ডেলা পাকাইয়া ভাত কিংবা কলা গিলিয়া খাইবে। অনেক সময় তাহাতেই কাঁটা নীচে নামিয়া যায়। সহজে তাহা সরিয়া না গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

দেহের ভিতর বাহিরের দ্রব্য।—ছোট ছোট ছেলেরা কখন কখন দুআনি, সিকি, বোতাম বা তদ্রূপ দ্রব্য গিলিয়া ফেলে। প্রায়ই মলের সহিত উহা দুই তিন দিনে বাহির হইয়া যায়। যাহাতে মলের পরিমাণ বাড়ে এমন খাদ্য সে সময় দিবে। এই সকল পদার্থ ভিতরে আটকাইলে মহা বিপদ আসিয়া পড়ে। দরকার হইলে রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে ছবি লইয়া ডাক্তারেরা কর্তব্য স্থির করেন।

নাকের রন্ধ্রের মধ্যে কড়াই, তেঁতুল বিচি, ভাঙা পেনসিল ইত্যাদি ঢুকাইয়া অনেক বালকবালিকা বিপদে পড়ে। জলের পিচকারি দিয়া তাহা বাহির করা যায়। হাঁচি উৎপন্ন করিলেও তাহার সহিত এগুলি নাক হইতে বাহির হইয়া যায়। দরকার হইলে বমন উৎপন্ন করিয়া, বমনকালে মুখ চাপিয়া, ঐ বমি নাকের ভিতর দিয়া বাহির করিবে। উহাতে পশ্চাৎ হইতে

ঠেলা পাইয়া দ্রব্যটি বাহির হইয়া যাইবে। যাহা হউক, বেশি খোঁচাখুচি করিবে না; আবশ্যক হইলে ডাক্তারেরা অস্ত্রাদির সাহায্যে দ্রব্যটি বাহির করিয়া দেন।

কানের ভিতর পোকা প্রবেশ করিলে খোঁচাখুচি না করিয়া তেল ঢালিয়া দিবে। তাহাতে পোকা মরিয়া যাইবে এবং তখন জলের পিচকারি করিয়া তাহা বাহির করিয়া ফেলিবে।

অগ্নিদাহ।—অগ্নিশিখায় বস্ত্রাদি ধরিয়া গিয়া কিংবা জ্বলন্ত অঙ্গার ও অত্যুষ্ণ পদার্থাদির সংস্পর্শে গাত্র দগ্ধ হইয়া থাকে। গাত্রচর্ম যত অধিক বিস্তৃতভাবে দগ্ধ হয়, ততই বিপদের আশঙ্কা গুরুতর হইয়া উঠে। কোন কোন স্থলে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বা অব্যবহিত পরেই অত্যন্ত অবসাদ আসিয়া রোগীর মৃত্যু হয়। যেস্থলে অগ্নিদাহে বিলম্বে মৃত্যু হয়, সেস্থলে শারীরিক যন্ত্রাদির প্রদাহ বা পীড়াই মৃত্যুর কারণ।

পরিধেয় বস্ত্রাদিতে আগুন লাগিলে উহা তৎক্ষণাৎ টানিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহা অসম্ভব হইলে রোগীকে তখনি মাটিতে শোয়াইয়া কম্বল, শতরঞ্চ কিংবা ঐরূপ কোন পুরু বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা চাপিয়া ধরিবে। এইরূপ করিলে অগ্নি আপনা হইতে নিবিয়া যাইবে। জল প্রক্ষেপেও অগ্নি নির্বাপিত হইতে পারে। চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার পূর্বেই তুলা কিংবা পুরু পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ক্যারন অয়েলে (carron oil) ভিজাইয়া যত সত্বর সম্ভব, ক্ষতস্থান ঢাকিয়া দিবে। চুনের জল ও তিসির তৈল একত্রে মিশ্রিত করিলে ক্যারন অয়েল প্রস্তুত হয়। তিসির তৈলের পরিবর্তে অলিভ অয়েল বা নারিকেল তৈল ব্যবহার করা যাইতে

পারে। তূলা কিংবা বস্ত্রখণ্ড তৈলে ভিজাইয়া লইবে, নতুবা ক্ষতের উপর উহা লাগিয়া যাইবে এবং সহজে ছাড়ান যাইবে না। ক্ষতের সহিত দগ্ধ বস্ত্রাদি সংশ্লিষ্ট থাকিলে, তৈলে নিষিক্ত হওয়ায় তাহা আপনা হইতে উঠিয়া আসে। দগ্ধস্থানে আলু-বাটা অথবা ডিম্বের শ্বেতাংশ লাগাইয়া দিলে জ্বালার উপশম হয়। ক্ষতস্থানে ময়লা দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিলে উহা দূষিত হইয়া পড়ে, এবং ধনুষ্টংকার রোগ হইতে পারে। দগ্ধস্থানে ফোস্কা পড়িলে উহার উপরের ছালগুলি শীঘ্র তুলিবে না। রোগীর অবসাদ উপস্থিত হইলে তাহাকে উত্তেজক ঔষধ (ব্রাণ্ডি) দিবে এবং গাত্রাদি গরম রাখিতে চেষ্টা করিবে। দগ্ধস্থানের চিকিৎসায় ট্যানিক (tannic) অ্যাসিড লোশনের অনবরত প্রয়োগে বেশ উপকার হয়। কোন পটি বা ঢাকা না দিয়া স্প্রের সাহায্যে ক্ষতের উপর নিয়ত ঐ ঔষধের একটা আবরণ দিয়া রাখিলে শীঘ্র ক্ষত সারিয়া যায়। পিকরিক (picric) অ্যাসিড লোশনেও উপকার হয় কিন্তু ডাক্তার ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহা পাওয়া কঠিন।

জলে ডোবা।—জলমগ্ন ব্যক্তিকে যত শীঘ্র সম্ভব জল হইতে উঠান আবশ্যক। জল হইতে উঠাইয়া মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। প্রথমেই তাহার মুখ ও নাসিকার ভিতর হইতে কর্দমাদি বাহির করিয়া, গাত্রের বস্ত্রাদির বন্ধন শিথিল করিয়া দিবে এবং তাহার জিহ্বা ভিতর হইতে সম্মুখে টানিয়া আনিবে। তাহার শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইবে। সেজন্য তাহার গাত্র ঘর্ষণ করিবে, অথবা গরম জলের বোতল তাহার পায়ের বা

গাত্রের অন্যান্য স্থানে সংস্থাপন করিবে এবং শুষ্ক কম্বলে তাহার দেহ আবৃত করিয়া দিবে। মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাইতে হইলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদনে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়। এক ঘণ্টা কিংবা তাহারও অধিককাল এইরূপ চেষ্টা করা কর্তব্য; শীঘ্র হতাশ হইবে না। বাস্তবিক যতক্ষণ বাঁচিবার একটুমাত্রও আশা থাকে, ততক্ষণ ইহাতে ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। এমনও শুনা গিয়াছে যে, তিন চারি ঘণ্টাকাল এইরূপ কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদন করিবার পর অবশেষে রোগী বাঁচিয়া উঠিয়াছে। রোগী খাইতে সক্ষম হইলেই জলের সহিত ব্রাণ্ডি মিশাইয়া খাইতে দিবে।

কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস প্রণালী।—রোগীকে প্রথমত চিৎ করিয়া শোয়াইতে হইবে, এবং দুইটি বালিশ বা কাপড়ের পুঁটলি অথবা তদনুরূপ ইষ্টক বা কাষ্ঠখণ্ড, যাহা শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহা লইয়া, একটি রোগীর স্কন্ধের নিম্নে এবং অপরটি তাহার গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে এরূপভাবে সংস্থাপন করিবে যেন তাহার মস্তক পশ্চাদ্দিকে একটু ঝুলিয়া পড়ে। তৎপরে রোগীর মুখ সম্পূর্ণরূপে ব্যাদান করাইয়া ভিতর হইতে জিহ্বা টানিয়া বাহির করিবে। ইহার পর রোগীর বাহুদ্বয় কনুইয়ের নিকট ধরিয়া মস্তকের উপরিভাগে লইয়া যাইবে। ইহাতে বক্ষঃপঞ্জরের অস্থিসকল সমুন্নত হইবে, এবং সেই সঙ্গে স্বাভাবিক নিশ্বাস টানিবার মত বায়ু ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। পরক্ষণেই বাহুদ্বয় অবনত করিয়া বক্ষঃস্থলের উপর চাপিয়া ধরিবে। ইহাতে স্বাভাবিক নিশ্বাস ফেলার মত কতকটা

বায়ু ফুসফুসের ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। এইরূপে মিনিটে ১২, ১৪ বার বাহুদ্বয় একবার ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করিবে এবং পরক্ষণে পুনরায় ধীরে ধীরে অবনত করিতে থাকিবে। এই প্রণালীতে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদিত হইবে এবং এইরূপ করিতে করিতে আপনা হইতেই রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস চলিতে আরম্ভ হইবে। ইহার পর রোগী ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদন

(১)

(২)
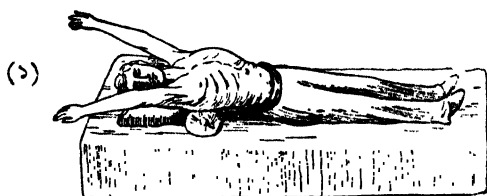
(১) নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ

(২) প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুস হইতে বায়ু নিকাশ

এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদনের চেষ্টা করিবার জন্য মাঝে মাঝে নাকের ভিতর নস্য দেওয়া, অথবা পালক দ্বারা সুড়সুড়ি দেওয়া, কিংবা পর্যায়ক্রমে মুখে ও বুকে গরম ও ঠাণ্ডা জলের ছিটা দেওয়া যাইতে পারে।

জলাতঙ্ক রোগ।—জলাতঙ্ক রোগ (hydrophobia) হইতে ভারতবর্ষে অনেক লোকের মৃত্যু হয়। এই রোগ ক্ষিপ্ত জন্তুর দংশন হইতে উৎপন্ন হয়। সাধারণত দংশনের পর এক মাস হইতে তিন মাসের মধ্যে ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়; কখন কখন খুব শীঘ্র এবং কখন বা দুই তিন বৎসরের পরেও ব্যাধি উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা অত্যন্ত সাংঘাতিক রোগ। ক্ষিপ্ত জন্তুর লালায় বিষ থাকে; ঐ বিষ যদি কোনরূপে গাত্রচর্মের ক্ষতে, অথবা দষ্ট স্থানে লাগে, তাহা হইলে জলাতঙ্ক রোগ জন্মে। জন্তু ক্ষিপ্ত না হইলে কেবল উহার দংশনে এই রোগ হয় না। সাধারণত ক্ষিপ্ত কুকুরই এই রোগের কারণ। কিন্তু খ্যাঁক্‌শিয়াল, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, বিড়াল, এমন কি গরু, ঘোড়াকেও ক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায়; তখন উহাদের দংশনেও এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

ক্ষিপ্ত কুকুর।—ক্ষিপ্ততা দ্বিবিধ; সঘোষ এবং নীরব। সঘোষ ক্ষিপ্ত কুকুর সর্বদা চীৎকার করে; নীরব ক্ষিপ্ততায় চীৎকার কিংবা শব্দ একেবারেই থাকে না। ক্ষিপ্ততার প্রথমাবস্থায় কুকুর প্রায় কোনরূপ দৌরাত্ম্য করে না; সর্বদাই শঙ্কিত ভাবে একস্থানে চুপ করিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু শীঘ্র তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে। তখন সে খাদ্যদ্রব্য ভোজন না করিয়া যাহা সম্মুখে পায় তাহাই চর্বণ করিতে চেষ্টা করে। তাহার স্বর বিকৃত হয় ও মুখ দিয়া লালা গড়াইতে থাকে। পিপাসায় কাতর হইলেও গলাধঃকরণে অসমর্থ হওয়ায় জলপান করিতে পারে না, বরং জল গিলিবার ভয়ে আতঙ্কপ্রাপ্ত হয়। এইজন্য ইহাকে

জলাতঙ্ক রোগ বলে। এইসময়ে কুকুর উন্মত্তভাবে ছুটাছুটি করে এবং যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে। ক্ষিপ্ত কুকুর ৮।১০ দিনের মধ্যেই মরিয়া যায়। কখন কখন ক্ষিপ্ত কুকুরের চলৎশক্তি রহিত হইয়া যায় এবং চোয়াল স্খলিত হইয়া পড়ে ; তখন সে সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ।—রোগ প্রকাশের সঙ্গে দষ্টস্থানে যন্ত্রণা এবং অসুখবোধ হয়। এই সময়ে বিষন্নতা, ক্ষুধামান্দ্য ও নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সর্বদাই মনে হয়, গলার ভিতর যেন কি আট্‌কাইয়া আছে ; জল খাইতে গেলেই গলদেশের পেশীতে আক্ষেপ হয় এবং জলপান করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। সময় সময় শ্বাসরোধও ঘটে। মুখের আকার বিকৃত ও ভীতিপ্রদ হয়। মুখে যেমন লালা সঞ্চিত হয়, রোগী অমনি যেখানে সেখানে ইহা ফেলিতে আরম্ভ করে ; এমন কি সময় সময় শুশ্রূষাকারীদের মুখে থুথু দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। রোগী ক্রমাগত চীৎকার করে এবং শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধারণত রোগী দুই চারিদিন ভুগিয়াই মারা যায়।

চিকিৎসা।—কোন জন্তুকে ক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হইলে, কিংবা যদি উহা কাহাকেও দংশন করে তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ উহাকে মারিয়া ফেলা যুক্তিসংগত নহে। কোনও কৌশলে উহাকে ধরিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিয়া পরীক্ষা করা উচিত যে উহা প্রকৃত ক্ষিপ্ত কি না। যদি দশ দিনের মধ্যে উহা মরিয়া না যায়, তাহা হইলে উহার দংশন হইতে জলাতঙ্ক রোগ জন্মিবার

আশঙ্কা থাকে না। আবশ্যক হইলে দংশনকারী জন্তুর মস্তকটি কাটিয়া লইয়া স্পিরিটে ভিজাইয়া তাহা পরীক্ষার্থ কলিকাতাস্থ বেলগাছিয়া পশুচিকিৎসালয়ে পাঠাইলে ভাল হয়। সেখানে মস্তিষ্ক পরীক্ষা দ্বারা রোগের অস্তিত্ব নির্ণয় করিবার বন্দোবস্ত আছে।

নাইট্রিক বা কার্বলিক অ্যাসিড কিংবা উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা ক্ষত স্থান যত শীঘ্র সম্ভব পোড়াইয়া দিবে। ক্ষিপ্ত জন্তু দংশন করিলে অনতিবিলম্বে জলাতঙ্ক রোগের টীকা (injection) লওয়া দরকার। এই চিকিৎসা প্রবর্ত্তনের পর হইতে এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে। অন্য কোন চিকিৎসায় এই রোগে ফল পাওয়া যায় না, অতএব বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সত্বর এই চিকিৎসা আরম্ভ করা কর্তব্য। এজন্য কলিকাতায় "ট্রপিক্যাল স্কুল" সংলগ্ন চিকিৎসালয়ে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আসামের শিলং শহরে এবং পাঞ্জাবে কশৌলীতেও এই রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে।

বিষধর কীট পতঙ্গের দংশন।—ভিমরুল, বোল্‌তা, মৌমাছি প্রভৃতি দংশন করিলে দষ্টস্থানে তীব্র আমোনিয়া প্রয়োগ করিবে; চুন লাগাইলেও উপকার হয়। চর্মে ইহাদিগের হুল বিদ্ধ হইলে উহা উঠাইয়া ফেলিবে। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই কাঁকড়া বিছা ও তেঁতুলে বিছা দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের দংশনে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। ছিদ্রযুক্ত চাবির সাহায্যে দষ্টস্থান হইতে হুল বাহির করিয়া সেখানে আমোনিয়া কিংবা টিংচার আইওডিন লাগাইয়া দিবে।

জোঁক বহু স্থানে দেখা যায় এবং তাহা আমাদের দেহের চর্ম ভেদ করিয়া রক্ত টানিয়া লয়। সাধারণত ছোট ও বড় দুইপ্রকার জোঁক পাওয়া যায়। জোঁক লাগিলে উহা টানিয়া ছাড়াইয়া ফেলিবে এবং ক্ষত স্থানে চুন লাগাইয়া দিবে।

সর্পাঘাত।—আমাদের দেশে সর্পাঘাতে বহুলোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। বিষধর সর্পের দাঁতের উপর-পাটীতে দুইটি বিষদাঁত থাকে। দংশন করিবার পর ইহারা সেই দাঁত হইতে বিষ ঢালিয়া দেয়। সেজন্য বিষধর সর্পের দংশন-স্থানে চর্মের উপর দুইটি ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পদংশনের চিকিৎসার ফল তাদৃশ অব্যর্থ না হইলেও, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতানুযায়ী চিকিৎসা অবলম্বন করাই কর্তব্য। ওঝার সাহায্যে বিষ নামাইতে যাওয়া কিংবা মন্ত্রতন্ত্রাদির উপর নির্ভর করিয়া থাকা নির্বোধের কার্য। কোন কোন সর্পের বিষ নাই বটে, কিন্তু কতকগুলি সর্প ভয়ানক বিষধর। দষ্টস্থান পরীক্ষা করিয়া সর্প বিষধর কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। সাপ মারা পড়িলে তাহা পরীক্ষা করিয়া ঠিক ধরা যাইতে পারে। সর্প বিষধর কি না স্থির করিতে না পারিলে, উহা বিষধর ভাবিয়াই যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

সর্পদষ্ট ব্যক্তি ক্ষণকালের মধ্যেই ঢলিয়া পড়ে। তখন তাহার মুখ হইতে ফেনা গড়াইতে থাকে, সর্বাঙ্গ বিবর্ণ হয়, নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে, শীঘ্রই সংজ্ঞালোপ হইয়া যায়, গলা ঘড়্ ঘড়্ করিতে থাকে, চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ হয়, শরীরে পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয় এবং রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সর্প দংশন করিবামাত্র দড়ি বা কাপড় ছিঁড়িয়া তাহার ফালি দ্বারা দষ্ট স্থানের উপর বাঁধিয়া ফেলিবে। ইহার ঊর্ধ্বে আরও একটি বন্ধন দিলে ভাল হয়। বন্ধন অনেকক্ষণ রাখা উচিত নয়, কারণ তাহাতে রক্ত-সঞ্চালন বন্ধ হইয়া ঐ স্থানের ক্ষতি হয়। যাহার মুখে কোনরূপ ঘা নাই, এমন ব্যক্তির দ্বারা দষ্টস্থান চোষাইয়া বিষ বাহির করিবার প্রথা আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। যাহাদের দাঁত খারাপ এবং দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়ে, তাহাদের এরূপ করিতে যাওয়া বিপজ্জনক। দষ্টস্থান চুষিলে শীঘ্রই ভাল করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিবে এবং জলে পটাস পারমাঙ্গানেট (Potash Permanganate) মিশাইয়া কুল্লি করিবে। বন্ধনের অব্যবহিত পরেই দষ্টস্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করাইবে। ছুরি দ্বারা দষ্টস্থান চিরিয়া সম্যক্‌ভাবে রক্ত বাহির করিয়া দিবে। পরে পটাস পারমাঙ্গানেটের চূর্ণ ক্ষতস্থানে উত্তমরূপে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। বৈজ্ঞানিকদের মতে ইহা সর্পদংশনের একটি উপকারী ঔষধ ; শীঘ্র প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা দ্বারা বিষক্রিয়া রোধ করা যায়। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহেই এই ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত ; ইহার দামও বেশি নহে, চারি পয়সার মত ঐ ঔষধ কিনিয়া রাখা যাইতে পারে। এন্টিভেনম (anti-venom) নামক ঔষধ শরীরের ভিতর প্রবিষ্ট করাইলেও সর্প-দংশনে উপকার হইতে পারে। অবসাদের লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগীকে উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবে।

রক্তপাত।—ক্ষতস্থান হইতে যে রক্ত বাহির হয় তাহা ধমনী, শিরা অথবা কৈশিক নালী হইতে পড়ে। ধমনীর রক্ত

ফিন্‌কি দিয়া নির্গত হয়। শিরার রক্ত বেগে বহির্গত হয় না বটে, কিন্তু অবিরত পড়ে। কৈশিক নালী হইতে রক্ত মৃদু বেগে বাহির হয় এবং উহা সহজে চাপ দিয়া বন্ধ করা যায়।

যে স্থান হইতে রক্ত নির্গত হয় তাহার উপর আঙুল দিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিবে, কিংবা সেস্থানে ছোট কাপড়ের পুঁটলি চাপিয়া বাঁধিয়া দিবে। কিন্তু বেশিক্ষণ এইরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখিবে না, কারণ রক্ত চলাচল একেবারে বন্ধ হইলে ঐ স্থানের শক্তি নষ্ট হইয়া পড়ে। বরফ বা শীতল জল প্রয়োগে রক্তপাত নিবারণ হয়। খুব গরম জল ব্যবহারে রক্ত বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু ঈষতুষ্ণ জলে রক্ত বন্ধ না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শীঘ্র রক্ত বন্ধ না হইলে চিকিৎসকের সাহায্য লইবে। আবশ্যক হইলে রোগীকে ঔষধ সেবন করান এবং ছিন্ন শিরা বা ধমনী বাঁধিয়া দিতে হয়।

নাসিকা হইতে রক্ত পড়িতে থাকিলে, ঘাড়ের উপর ও নাসিকায় শীতল জল দিবে, হাত দুইটি উঁচু করিয়া রাখিবে এবং মস্তক পশ্চাদ্ভাগে হেলাইয়া দিবে। আবশ্যক হইলে নাসিকার মধ্যে তূলার পুঁটলি প্রবিষ্ট করিয়া রক্তরোধ করিতে হয়। দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়িলে শীতল জলে ফট্‌কিরি মিশাইয়া কুল্লি করিলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

ভিতর হইতে রক্তপাত।—এরূপ স্থলে রোগীকে শোয়াইয়া তাহার নড়াচড়া বন্ধ করিবে এবং তাহাকে কথা কহিতে দিবে না। মাঝে মাঝে টুক্‌রা টুক্‌রা বরফ খাইতে দিবে। যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে, কারণ অতিরিক্ত রক্তপাতে মূর্ছা

এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে। এরূপ স্থলে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ব্রাণ্ডি প্রভৃতি ঔষধ দেওয়া ঠিক নয়।

বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ।—হঠাৎ কোন বিষাক্ত দ্রব্য গলাধঃকৃত হইলে যত শীঘ্র সম্ভব বমি করাইয়া তাহা বাহির করান আবশ্যক। এজন্য লবণ বা জিঙ্ক সল্‌ফেট (zinc sulphate) নামক ঔষধ গরম জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে বমি হইয়া যায়। আবশ্যক হইলে পাম্প দ্বারা পাকস্থলী ধুইয়া দিতে হয়। কোন বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্বেই ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া কর্তব্য, কিন্তু তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া সর্বাগ্রে রোগীকে বমন করাইবে। দ্রাবক বা তীব্র ক্ষারদ্রব্য উদরস্থ হইলে বমি করাইতে যাওয়া ঠিক নয়, একথা স্মরণ রাখিবে। তখন রোগীকে ডিম্বের শ্বেতভাগ, গাঢ় বার্লির জল বা দুধ খাওয়াইয়া দিবে; উহাতে বিষক্রিয়া কতকটা প্রশমিত হয়।

সন্ধিস্থলে আঘাত।—অস্থির সন্ধিস্থলে আঘাত লাগিলে প্রায়ই উহার বন্ধনীতে (ligaments) বেদনা ও যন্ত্রণা হয় এবং চতুর্দিক ফুলিয়া উঠে। চলিতে চলিতে হঠাৎ উঁচু-নীচুতে পা পড়িলে পায়ের গুল্‌ফ সন্ধি প্রায় মচ্‌কাইয়া যায়। মচ্‌কান স্থানে সত্বর বরফ লাগাইবে বা শীতল জলের পটি দিবে। গুলার্ড লোশন (Goulard lotion) নামক ঔষধে স্থানটি ভিজাইলে সত্বর উপকার পাওয়া যায়। মচ্‌কান স্থানের সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য নাড়া-চাড়া বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। সেজন্য একখণ্ড পিস্‌বোর্ড বা পাতলা কাষ্ঠখণ্ড সেখানে বাঁধিয়া দিবে। বেদনা কমিলে মালিসের ঔষধ ব্যবহার করিবে।

অস্থি ভঙ্গ।—অকস্মাৎ কোন প্রচণ্ড আঘাত পাইলে অস্থি ভাঙিয়া যায়। তাহাকে ফ্রাক্‌চার (fracture) বলে। অস্থিভঙ্গ হইলে সে স্থানের দৃঢ়তা নষ্ট হয় এবং তাহার আকার বদলাইয়া যায়। সেখানে বেদনা হয় এবং ফুলিয়া উঠে ও নড়া-চড়ার ক্ষমতা থাকে না। দেহের কোন অস্থি ভগ্ন হইলে অনতিবিলম্বে ডাক্তারের সাহায্য লইতে হইবে, কিন্তু তখনই অনেক সময় ডাক্তার পাওয়া যায় না। রোগীকে হাসপাতালে বা ডাক্তারের নিকট লইয়া যাইবার সময় আরও নাড়া-চাড়া পাইয়া কখন কখন বিষম ক্ষতি হয়। সেজন্য ভগ্ন-স্থানটিকে স্থির রাখার ব্যবস্থা দরকার। অতএব রোগীকে প্রাথমিক সাহায্য দিবার জন্য কি করা আবশ্যক তাহা সকলেরই জানা ভাল। ভগ্নস্থানটি অচল করিবার জন্য পাতলা কাষ্ঠখণ্ড বা বাঁশের চটা বাঁধিয়া দিবে। সেরূপ কিছু দ্রব্য না পাইলে, একটা ছাতা বা লাঠি, কিংবা তদনুরূপ দ্রব্য সেখানে বসাইয়া দুই প্রান্ত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবে।

অস্থির সন্ধিভ্রংশ।—আঘাত হইতে অস্থি ভাঙিয়া না গেলেও উহার প্রান্তদেশ স্বস্থান হইতে চ্যুত হইতে পারে; তাহাকে সন্ধিভ্রংশ (dislocation) বলে। তখন সেস্থানে বিষম বেদনা হয় ও নাড়া-চাড়া করা কঠিন হইয়া পড়ে। শীঘ্র ঐ অস্থিটি স্বাভাবিক স্থানে ফিরাইয়া বসান দরকার এবং সেজন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্য লইবে। কিছুদিন অচিকিৎসিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে অস্থিটি যেখানে গিয়া পড়িয়াছে সেখানেই আটকাইয়া যায় এবং পরে উহাকে সরান কঠিন হইয়া পড়ে।

(২) ব্যাণ্ডেজ ও স্প্লিণ্ট বাঁধা

ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কৌশল।—হঠাৎ পড়িয়া গেলে, বা কোন আকস্মিক কারণে দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে, বা অস্থি ভগ্ন বা স্থানচ্যুত হইলে, তখনই সেস্থান বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। অনেক সময় ডাক্তারের সাহায্য পাইতে বিলম্ব হয়। এরূপ স্থলে আঘাত বেশি হইলে তাহাতে প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনাও হয়। অতএব প্রাথমিক সাহায্য দানের জন্য আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে হইলে যে কৌশল দরকার তাহা সকলেরই জানা ভাল। সেজন্য ব্যাণ্ডেজ সম্বন্ধে কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা নিম্নে বলা হইল।

ব্যাণ্ডেজ কাহাকে বলে।—বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা বাঁধিয়া অঙ্গ-বিশেষের চালনা বন্ধ করিয়া রাখার নাম ব্যাণ্ডেজ (bandage) করা। ইহার সাহায্যে দেহের কোন অংশের উপর আবশ্যকমত চাপ প্রয়োগ করা যায়, কাটা স্থান বা ঘায়ের উপর ঔষধ, তূলা ইত্যাদি স্থানচ্যুত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা যায়, এবং ভগ্ন অস্থির উপরে স্প্লিণ্ট বা পাটা বাঁধিয়া দেওয়া যায়।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শিক্ষা।—ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যত্ন সহকারে শিখিতে হয়; কেবল পুস্তক পাঠে ইহা আয়ত্ত করা কঠিন। শিক্ষা ও অভ্যাস না করিলে দেহের বিভিন্ন স্থানের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যাণ্ডেজ ভাল করিয়া বাঁধা যায় না। এলোমেলো ভাবে কতকগুলা কাপড় জড়াইলেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয় না; বরং অন্যায়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধায় ক্ষতি হইতে পারে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শিখিতে হইলে শিক্ষকের নিকট দেখিয়া লইয়া অভ্যাস করিবে।

ব্যাণ্ডেজের রকম।—সাধারণত যে সকল ব্যাণ্ডেজ ব্যবহৃত হয় সেগুলি চারি প্রকারের, যথা :—

(১) **ত্রিকোণাকৃতি (triangular) ব্যাণ্ডেজ।**—লম্বায় ও প্রস্থে আন্দাজ ৩০।৪০ ইঞ্চি একখানি মজবুত কাপড় কোনাকুনি পাট করিলে ত্রিকোণাকৃতি ব্যাণ্ডেজ হয়। হঠাৎ দরকারের সময় যে কোন কাপড় হইতে উহা তৈয়ারি করিয়া লওয়া যায়। উহাকে পাটের পর পাট করিয়া নানারূপ ব্যাণ্ডেজের কাজে লাগান যাইতে পারে।
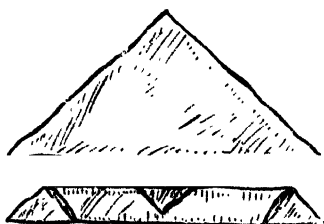
ত্রিকোণাকৃতি ব্যাণ্ডেজ

(২) **গুটান বা রোলার (roller) ব্যাণ্ডেজ।**—১, ২, ৩, ৪, ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং লম্বায় ৭ বা ৮ ফুট মজবুত অথচ পাতলা বস্ত্রখণ্ড গুটাইয়া লইয়া এই ব্যাণ্ডেজ তৈয়ারি করা হয়। কাপড়টি খস্‌খসে হইলে ভাল হয়। উহা আঁট করিয়া গুটাইতে হয়। দেহের সকল স্থানে একরকম চওড়া ব্যাণ্ডেজ চলে না বলিয়া বিভিন্ন মাপের ব্যাণ্ডেজ তৈয়ারি করা হয়। রোলার ব্যাণ্ডেজের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশি।
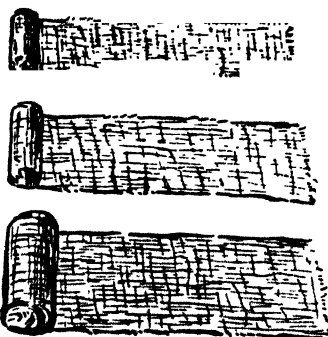
গুটান বা রোলার ব্যাণ্ডেজ

(৩) তুইপ্রান্তে বহু বিভক্ত বা মেনি-টেল (many-tail) ব্যাণ্ডেজ।—যেখানে বাঁধা হইবে সেই স্থানের উপযোগী করিয়া ইহার আয়তনের মাপ করা হয়। স্থানের ঘের অপেক্ষা ইহা লম্বায় ৮।১০
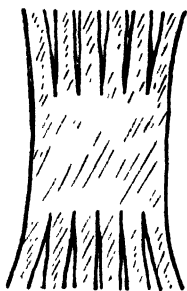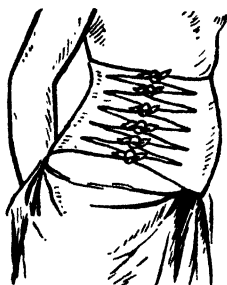
বহু বিভক্ত ব্যাণ্ডেজ বহু বিভক্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা

ইঞ্চি বড় হইবে, এবং যতটা স্থান আবৃত করিতে হইবে ততটা চওড়া হইবে। তুইপ্রান্ত কয়েকখণ্ডে ছিঁড়িয়া দেওয়া হয়, (চিত্র দেখ) এবং ব্যবহার কালে ঐ প্রান্তভাগগুলি পরস্পরের সহিত ক্রমান্বয়ে গাঁইট দিয়া বাঁধা হয়। এই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যেমন সহজ তেমনি ইচ্ছা করিলে সহজেই খুলিয়া ফেলা যায়, এবং খোলার সময় রোগীকে বেশি নাড়াচাড়া করিতে হয় না।
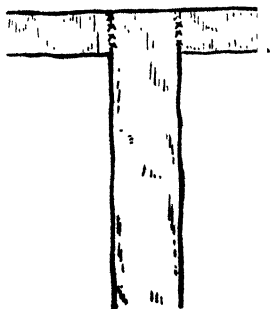
টি (T) ব্যাণ্ডেজ

(৪) টি ব্যাণ্ডেজ।—দেখিতে ইংরেজী Tএর মত বলিয়া ইহার ঐ নাম হইয়াছে। ইহা অনেকটা কৌপীনের মত। একখণ্ড

৩ ইঞ্চি চওড়া ও ৩ হাত লম্বা কাপড়, আর একখণ্ড ৪।৫ ইঞ্চি চওড়া ২ হাত লম্বা কাপড়ের সহিত, Tএর মত করিয়া সেলাই করিয়া লইলে এই ব্যাণ্ডেজ তৈয়ারি হয়। দেহের স্থানবিশেষের জন্য এই ব্যাণ্ডেজের ব্যবহার হয়।

ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার।—নানাবিধ কাজের জন্য ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার হয়। দেহের ক্ষতস্থানে ঔষধাদি বাঁধিয়া রাখার জন্য প্রায়ই ব্যাণ্ডেজের দরকার হয়। কোথাও ফুলিলে বা বেদনা হইলে তাহাতে ব্যাণ্ডেজ দরকার হয়। কোন অস্থি ভগ্ন হইলে, ভাঙা মুখ দুইটি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া নাড়া-চাড়া বন্ধের জন্য চাপিয়া ব্যাণ্ডেজ করিতে হয়। রক্তস্রাব বন্ধ করার জন্য কখন কখন ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করিয়া বাঁধিতে হয়। পায়ে বা হাতে শোথ হইলে তাহা কমাইবার জন্যও ব্যাণ্ডেজ বাঁধার ব্যবস্থা আছে।

ব্যাণ্ডেজের নিয়ম।—ব্যাণ্ডেজ সুন্দর, শক্ত ও উপযোগী করিয়া বাঁধিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম পালন করা আবশ্যক। সেগুলি সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল—

(১) ব্যাণ্ডেজের কাপড় টান-সহ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে এবং তাহা শক্ত করিয়া জড়াইবে। যদি কোনস্থানে সেলাই করা হয়, টান দিলে তাহা যেন খুলিয়া না যায়।

(২) গাত্রের ভিতর দিক হইতে ব্যাণ্ডেজ আরম্ভ করিয়া বাহির দিকে যাইতে হয় এবং রোলার ব্যাণ্ডেজটি যাহাতে সহজে খুলিয়া বাহির দিকে গড়াইয়া যায় তেমন করিয়া ধরিতে হয়। পরিমিত ভাবে চাপ দিয়া ইহা বাঁধিতে হয়, নতুবা খুলিয়া যাইতে পারে।

(৩) নীচু হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বাঁধিতে ক্রমে উপর দিকে উঠিবে। নীচে যে ভাবে চাপ দিবে, উপরের ভাগে তাহা ক্রমে ক্রমে কমাইবে।

(৪) ব্যাণ্ডেজের নীচে তূলা বা নরম কাপড় পাট করিয়া দিতে হয়, নতুবা দেহের ভিতর অত্যধিক চাপ পড়িলে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হইতে পারে। তখন সে স্থানে যন্ত্রণা হয় ও ফুলিয়া উঠে।

(৫) ব্যাণ্ডেজ জড়াইবার সময় একটি পাকের উপর পরবর্তী পাকটি যাহাতে দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ ঢাকিয়া পড়ে এমন করিয়া বসাইবে।

(৬) সন্ধিস্থলগুলিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হইলে বাংলা ৪এর মত করিয়া দুইদিকে বৃত্তাকারে ঘুরাইয়া জড়াইতে হয়। অন্য-প্রকার ব্যাণ্ডেজ এখানকার উপযোগী হয় না।

(৭) ব্যাণ্ডেজের শেষ প্রান্তটি সেফ্‌টি-পিনের দ্বারা বা সেলাই করিয়া আবদ্ধ করিয়া দিবে। উহা এমন স্থানে বাঁধিবে যেন সহজে খোলা যায়। পিনটি গায়ে না ফোটে তাহা দেখিবে।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধার প্রণালী।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনের বিভিন্নতা অনুসারে নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইয়া থাকে—

(১) **পাক দিয়া জড়ান।**—ইহা সর্বাপেক্ষা সহজ। রোলার ব্যাণ্ডেজ পাক দিয়া জড়াইয়া দিতে হয়। স্থানটির উপর ও নীচের পরিধি একরূপ হইলে ইহা সহজে খুলে না।

(২) **উল্‌টা পাক দিয়া জড়ান**।—যে স্থানের পরিধি ক্রমে কম হইতে বেশি হইয়াছে, অর্থাৎ নীচে সরু এবং উপরে মোটা এমন স্থানে, পাক দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সময় ব্যাণ্ডেজ উল্‌টাইয়া লইতে হয়, নতুবা শক্ত করিয়া বাঁধা যায় না।
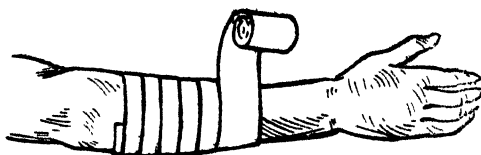
পাক দিয়া জড়ান

(৩) **৪ এর মত জড়ান**।—সন্ধিস্থলে ব্যাণ্ডেজ করিতে হইলে ৪ এর আকারে দুইটা পাক দুই দিকে ঘুরাইয়া বাঁধিতে হয়। সন্ধিস্থলের এই ব্যাণ্ডেজ শীঘ্র খুলিয়া যায় না। একটু দেখিয়া লইলে ইহা সকলেই করিতে পারে।
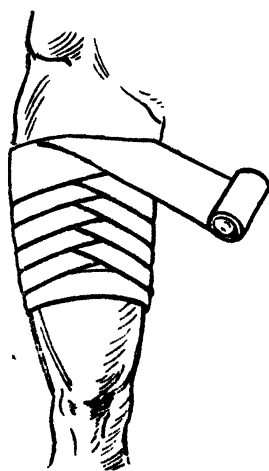
উল্‌টা পাক দিয়া জড়ান

(৪) **স্পাইকা ব্যাণ্ডেজ**।—ইহা প্রায় তৃতীয় প্রণালীর ন্যায়, কিন্তু একদিকের প্যাঁচটি ছোট এবং অন্য দিকের প্যাঁচটি বড় হয়। স্কন্ধদেশ, কোমর, গোড়ালি ইত্যাদি স্থানে এইরূপ ব্যাণ্ডেজের দরকার হয়। একদিকে বড় প্যাঁচটি ও অন্যদিকে ছোট প্যাঁচটি উপর ও নীচে জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিতে হয়।

স্প্লিণ্ট বাঁধা।—অস্থি ভগ্ন হইলে সেই স্থান কিছুদিন অচল করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ডাক্তারেরা নানাবিধ স্প্লিণ্ট (splint) ব্যবহার করেন। উহা ভগ্নস্থানের সহিত ব্যাণ্ডেজ করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সেগুলি পাতলা কাষ্ঠ বা লোহার চাদর দিয়া ভগ্নস্থানের উপযোগী করিয়া তৈয়ারি করা হয়। নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন মাপের তৈয়ারি স্প্লিণ্ট বাজারে বিক্রয় হয়।

স্প্লিণ্ট বাঁধিয়া দিবার পূর্বে ভগ্ন অস্থির দুই প্রান্ত পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় বসান নিতান্ত আবশ্যক। অনভিজ্ঞ লোকের দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। অতএব সুচিকিৎসকের সাহায্য লইতে হইবে। স্প্লিণ্টের সঙ্গে ভগ্ন স্থানের চতুর্দিকে তূলা অথবা নরম কাপড় ভাঁজ করিয়া দিতে হয় এবং শক্ত করিয়া ব্যাণ্ডেজ করিতে হয়। হাতের অস্থি জোড়া লাগিতে প্রায় দুই সপ্তাহ এবং পায়ের অস্থি প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পচন নিবারক ও বীজঘ্ন দ্রব্যাদি

জীবাণু।—পূর্বে বারবার বলা হইয়াছে যে সংক্রামক ব্যাধিগুলি জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়। এগুলি এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না। জীবাণুগুলির সংখ্যা-বৃদ্ধি এত দ্রুত হইয়া থাকে যে, কয়েক ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ জীবাণু উৎপন্ন হইতে পারে। দুর্গন্ধময়, বায়ু-প্রবাহ-রহিত, অথবা অন্ধকার স্থানে ইহারা সহজেই বৃদ্ধি পায়। প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা ইত্যাদি সংক্রামক রোগ জীবাণু হইতেই উৎপন্ন হয় এবং সেগুলি বাহির হইতেই আমাদের দেহে প্রবেশ করে। আমাদের দেহে জীবাণুর তিনটি প্রবেশ-দ্বার আছে;—সেগুলি মুখ, নাসিকা ও গাত্রচর্ম। জীবাণু আমাদের খাদ্যের সহিত মুখের ভিতর দিয়া উদরে প্রবেশ করে, অথবা বায়ুর সঙ্গে ধূলা বা ময়লার সহিত মুখে ও ফুসফুসে চলিয়া যায়, কিংবা কীটপতঙ্গাদি ও জন্তুর দংশনে বা নানাবিধ আঘাতের ফলে চর্ম ভেদ করিয়া দেহের ভিতর প্রবেশ করে। দেহের ভিতর জীবাণুগুলির প্রবেশ নিবারণ করিতে না পারিলে সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকা কঠিন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাদের ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জীবাণুর ধ্বংস।—সংক্রামক ব্যাধির জীবাণুর বিনাশ সাধনের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয় তাহাকে নির্বীজন

(disinfection) বা সংক্রমণ-নাশন বলা হয়। যে সকল দ্রব্যের ব্যবহারে তাহা সংসাধিত হয় সেগুলিকে বীজঘ্ন (disinfectant) সংক্রমণ-নাশক বলে। কতকগুলি দ্রব্য (antiseptic) পচন নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার জন্য কতকগুলি গন্ধনাশক দ্রব্য (deodorant) ব্যবহার করা হয়। উহারা জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করে। এইজন্য মূত্রত্যাগের স্থানে কয়লা, ফেনাইল, চুন, প্রভৃতি ছড়ান হয়। পায়খানার বা মলের গামলায় যে আল্‌কাতরা লাগান হয় তাহারও এই উদ্দেশ্য।

জীবাণু ধ্বংসের প্রণালী।—সূর্যকিরণে ব্যাধির জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়, এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে উহারা থাকিতে পারে না। ইহাই জীবাণু ধ্বংসের স্বাভাবিক প্রণালী। রৌদ্র ও বিশুদ্ধ বায়ু না পাইলে জীবাণু হইতে আত্মরক্ষা করা আমাদের কঠিন হইত। ইহাদের উপকারিতা সম্বন্ধে পূর্বেই আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। কোন একটা স্থান বা দ্রব্যের সংক্রমণ দোষ শোধনের জন্য তিনটি প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে, যথা :—

(১) **ধূম প্রয়োগ।**—আমাদের দেশে ধুনা গন্ধক ইত্যাদির ধূম প্রয়োগ দ্বারা গৃহ বিশোধনের প্রথা প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু ব্যাধি সংক্রমণ দোষ ঘটিলে কেবল ঐ গুলির উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায় না। ক্লোরিন বাষ্প, ফর্মালিন নামক দ্রব্যের বাষ্প এবং কার্বলিক অ্যাসিডের ভাপ দিলে বেশ সুফল পাওয়া যায়। বসন্ত, হাম প্রভৃতি রোগের বায়ু-বাহিত জীবাণু ধ্বংস করিবার জন্য ঐ রূপ ধূম প্রয়োগ করা হয়।

(২) **উত্তাপ প্রয়োগ।**—নির্বীজন করিবার জন্য উত্তাপ

প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। নিম্নলিখিত প্রণালীতে উত্তাপ প্রয়োগ করা যায় ;—অগ্নিশিখা প্রয়োগ, অত্যুষ্ণ জলে ফুটাইয়া লওয়া, উত্তপ্ত শুষ্ক বায়ু দ্বারা ভাপ প্রদান, উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের ভিতর দ্রব্য সংস্থাপন, এবং বিশেষভাবে নির্মিত স্টোভের ভিতর বীজঘ্ন দ্রব্য মিশ্রিত বাষ্পে চাপ প্রয়োগপূর্বক তাহার ব্যবহার। উত্তপ্ত বায়ু প্রয়োগে আপত্তি এই যে, রোগের জীবাণু নষ্ট করিতে হইলে যে পরিমাণ উত্তাপ আবশ্যক হয়, তাহাতে গৃহের আসবাবপত্রাদি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। চর্ম এবং রবার নির্মিত বা তদনুরূপ দ্রব্যাদি উত্তাপে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। কিছুক্ষণ ধরিয়া জলে না ফুটাইলে সকল রোগের জীবাণু নষ্ট হয় না। জল ও দুগ্ধকে জীবাণুবর্জিত করিতে হইলে ১০।১৫ মিনিট আগুনে ফুটাইতে হয়। অস্ত্র চিকিৎসার জন্য ডাক্তারেরা যন্ত্রগুলিকে জীবাণু-শূন্য (sterilise) করিবার জন্য কিছুক্ষণ ধরিয়া জলে ফুটাইয়া লন।

(৩) **রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার।**—বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে। সংক্রমণ নাশনের জন্য সাধারণত কয়েকটি দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কার্বলিক অ্যাসিড ও হাইড্রার্জ পারক্লোরাইড প্রধান। পটাস পারমাঙ্গানেট, ফেনাইল, সিলিন, আইজল, লাইজল, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদিও সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ঐগুলি জলের সহিত মিশাইয়া কিংবা কোন কোনটি চূর্ণাবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

কার্বলিক অ্যাসিড।—একভাগ কার্বলিক অ্যাসিডের সহিত ২০ হইতে ৪০ গুণ ফুটান জল মিশাইয়া ইহার লোশন তৈয়ারি

হয়। উহাতে জামা কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য শোধন করা যায়। থুথু, কফ্, শ্লেষ্মার দোষ নষ্ট করিবার জন্য পিকদানিতে ঐ লোশনের ব্যবহার চলিত আছে।

পটাস পারমাঙ্গানেট।—ইহার একভাগ ৫০ হইতে ৬০ গুণ জলের সহিত মিশাইলে যে লোশন হয়, তাহা দ্বারা রোগীর ঘরের আসবাবাদি ধৌত করিলে সেগুলি শোধিত হয়, কিন্তু ইহাতে কাপড় নষ্ট হইয়া যায়। কূপ বা পুষ্করিণীর জল দূষিত হইলে, ইহা দ্বারা সেই জল বিশোধিত করা যায়।

হাইড্রার্জ পারক্লোরাইড।—ইহার বাংলা নাম রসকর্পূর। ইহা পারদ ঘটিত অতি বিষধর্মী ঔষধ; কিন্তু জীবাণু নাশ করিবার জন্য বিশেষ উপযোগী। ইহার একভাগের সহিত ১০০০ গুণ বা আরও অধিক জল মিশাইয়া লোশন করা হয়। বিষ বলিয়া এ লোশন অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। ইহার কোন রঙ না থাকায়, সহজে কেহ ভুল না করে সেজন্য, সর্বদা সেই লোশন নীল রঙ করিয়া রাখা উচিত। এই লোশনে ধাতুদ্রব্য কলঙ্কিত হয়। ইহার ছোট ছোট চাক্তি পাওয়া যায়, তাহা জলে মিশাইলেই লোশন তৈয়ারি হয়।

ফেনাইল।—ইহা কার্বলিক অ্যাসিডের অনুরূপ। সস্তা বলিয়া ইহার যথেষ্ট প্রচলন। কিন্তু কোন কোনটার বীজনাশন শক্তি নিতান্ত কম। ভাল মন্দ ফেনাইল অনুসারে উহাতে বেশি বা কম পরিমাণ জল মিশাইতে হয়। প্রায়ই ইহা দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য নর্দমা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

সিনিল, আইজল, লাইজল।—ইহাদের একভাগে আন্দাজ

১০০ ভাগ জল মিশাইতে হয়। দামী বলিয়া এগুলির ব্যবহার বেশি দেখা যায় না।

চুন ইত্যাদি।—দুর্গন্ধনাশক দ্রব্যাদির মধ্যে চুন, শুষ্ক মৃত্তিকা, কার্বলিক পাউডার, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি সাধারণত ব্যবহৃত হয়। ঘরের দেওয়ালে কলি দিলে জীবাণু নষ্ট হয়। ১০ ভাগ সুরকির গুঁড়ায় ১ ভাগ কার্বলিক অ্যাসিড মিশাইয়া একটি উৎকৃষ্ট দুর্গন্ধনাশক পদার্থ প্রস্তুত হয়।

মলমূত্রাদি বিশোধন।—রোগীর মল, মূত্র, শ্লেষ্মা, কফ্, বমি, পূঁয ইত্যাদিতে যত শীঘ্র সম্ভব সংক্রমণ-নাশক লোশন ঢালিয়া দিবে। রোগীর বমি ও মলমূত্রাদির জন্য ব্যবহৃত পাত্রাদিতে পূর্বেই একটা বীজঘ্ন লোশন ঢালিয়া রাখিবে। পরে এই সকল পদার্থ যখন একত্র করিবে তখন, তাহাতে আরও বীজঘ্ন পদার্থ মিশ্রিত করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব পোড়াইয়া ফেলিবে অথবা পুতিয়া ফেলিবে।

বস্ত্র এবং শয্যাদি বিশোধন।—সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর বস্ত্র এবং শয্যাদি পোড়াইয়া ফেলাই শ্রেয়। বাস্তবিক অল্প মূল্যের দ্রব্যাদি পোড়াইয়া ফেলাই উচিত। বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও শয্যা কোন বীজঘ্ন দ্রব্য মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিবে; সিদ্ধ করিতে আপত্তি থাকিলে অন্তত ২৪ ঘণ্টা ঐ জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত। বহুমূল্য রেশমী বস্ত্রাদি, যাহা বিশোধক দ্রব্যের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, সেগুলিকে রৌদ্রে বেশ উত্তপ্ত করিয়া লইবে।

ঘর ও আসবাবপত্র বিশোধন।—বাহিরের নির্মল বাতাস

এবং সূর্যের উত্তাপ যাহাতে বেশ গৃহে প্রবেশ করে তাহার ব্যবস্থা করিবে। কাঠের জিনিসগুলি গরম জলে এবং সাবান দ্বারা রগড়াইয়া ধুইয়া ফেলিবে, কিংবা ৩০০০ ভাগ জলে ১ ভাগ হাইড্রার্জ-পারক্লোরাইড বা ১০০ ভাগ জলে ২ ভাগ চুন মিশাইয়া তাহা প্রয়োগ করিবে। গৃহের দেওয়ালগুলিও ঐরূপ বিশোধক জলে ধুইয়া ফেলিবে। এজন্য একরূপ হস্ত-চালিত যন্ত্র (spray) বা পাম্প ব্যবহার করা হয়। পিচকারিও স্থলবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সংক্রামক রোগীর ঘরে যেন নির্মল বায়ু চলাচল করিতে পারে এবং ঘরটি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। সে ঘরে আসবাবপত্রাদি যত কম থাকে ততই মঙ্গল। অনাবশ্যক কাপড়-চোপড়, বিছানা, মাদুর, পুস্তক, কাগজপত্র সেখানে কিছু রাখিবে না; যদি কিছু থাকে, বিশোধন না করিয়া তাহা অন্যত্র লইয়া যাইবে না। স্থানান্তরিত করিবার পূর্বেই রোগীর মলমূত্রাদি বিশোধন করা কর্তব্য, তাহা মনে রাখিতে হইবে। রোগীর শুশ্রূষাকারীদের বস্ত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে এবং কেহই রোগীর গায়ে হাত দিয়া সেই হাতে কিছু পান বা ভোজন করিবে না। রোগীর শুশ্রূষাকারী অন্য যে কেহ তাহার সংস্পর্শে আসিবে তাহার হস্তপদাদি বীজঘ্ন দ্রব্যের জলে ধুইয়া ফেলা উচিত। রোগের প্রসার প্রতিরোধ করিতে হইলে শুদ্ধাচারের একান্ত প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

জল ও উহার প্রাপ্তিস্থান

জল।—হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সংযোগে জল উৎপন্ন হয়। জলের রূপ তিন প্রকার, যথা, বাষ্পীয়, কঠিন বা ঘনীভূত এবং দ্রব বা তরল। জল ফুটাইলে বাষ্পাকার ধারণ করে এবং ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হইলে ইহা বরফ হয়। বাষ্প, কুয়াসা, মেঘ, শিশির, বৃষ্টি, তুষার ইত্যাদি জলের রূপান্তর মাত্র।

বিশুদ্ধ জল স্বচ্ছ ও তরল এবং উহাতে কোন গন্ধ, স্বাদ বা বর্ণ থাকে না। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জল পাওয়া যায়। ভূগর্ভের ভিতর বহু নিম্নেও জলপ্রবাহ আছে।

জলের প্রয়োজনীয়তা।—জল বিনা আমাদের জীবন ধারণ অসম্ভব। এই জল রক্তের তরলতা রক্ষা করে, দেহ হইতে দূষিত পদার্থের বহির্গমনের সহায়তা করে এবং ইহা দেহের নানাপ্রকার ক্রিয়াসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয়। বরং খাদ্যাভাবে কিছুদিন চলে, কিন্তু জল না পান করিলে তিন চার দিনেই মৃত্যু হয়। আমাদের প্রত্যহ প্রায় দেড় সের জল পান করা দরকার হয়। তদ্ভিন্ন রন্ধন, স্নান, শৌচাদি, কাপড় কাচা, ঘর ধোয়া, বাসন মাজা ইত্যাদি কাজে যে জল আমাদের দরকার হয়, তাহাও কম নহে। রাস্তায় জল দেওয়া, অগ্নি নির্বাপিত করা, ড্রেন, নর্দমা প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা, নানাবিধ গৃহস্থালির দ্রব্য পরিষ্কার করা ইত্যাদির জন্য প্রভূত পরিমাণে জলের আবশ্যক হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল

না পাইলে আমাদের নানাবিধ বিপদ ও অসুবিধা হয়। গ্রীষ্মকালে নদী, পুকুর শুকাইয়া গেলে জলকষ্টে বাংলাদেশের কত লোক যে কষ্ট পায় ও দূষিত জল পান করিয়া প্রাণ হারায় তাহার ইয়ত্তা নাই। মানব ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর এবং উদ্ভিদের জন্যও জলের প্রয়োজন কম নহে। গাছপালা, জীবজন্তু সকলেরই জলের দরকার। জল বিনা শস্য জন্মে না, খাদ্য পাওয়া কঠিন হয় এবং দুর্ভিক্ষ, রোগ ও মৃত্যু আসিয়া পড়ে।

জলের প্রাপ্তিস্থান।—সমুদ্রের জল অসীম, কিন্তু লবণাক্ত হওয়ায় তাহা মানুষের পানের উপযোগী নহে। সে যাহা হউক, সমুদ্র, হ্রদ ও নদনদী হইতেই জল বাষ্পাকারে উঠিয়া বায়ুমণ্ডলে মেঘের সৃজন করে। পরে বৃষ্টির আকারে উহা নামিয়া আসিয়া নদী, খাল, বিল পূর্ণ করে। ঐ বৃষ্টির জল হইতেই পাহাড়ে তুষারপাত হয় ও বরফ জমে এবং তাহা গলিয়া জল হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র যাইয়া পড়ে। উহারই কিয়দংশ ভূপৃষ্ঠের নিম্নে যাইয়া জমে। বৃষ্টির জল এবং নদী, ঝরনা বা উৎস, কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদি হইতে আমরা পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া থাকি।

পৃথিবীর নিম্নপ্রদেশ হইতে যে জল উপরে উঠে তাহার নাম **উৎস**। ফাঁপা নল গভীরভাবে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া পাম্পের সাহায্যে জল বাহির করা যায়; ইহাকে **নলকূপ** বা **টিউব-ওয়েল** (tube-well) বলে। এই জল নির্মল, উৎকৃষ্ট এবং পানের উপযোগী। আজকাল ক্রমেই ইহার প্রচলন বাড়িতেছে।

ভূপৃষ্ঠ হইতে ৫০ ফুট বা তদধিক গভীর কূপকে **গভীর কূপ** বলা হয়। গভীর কূপের জল প্রায়ই নির্মল ও ব্যবহারোপযোগী

হয়। অনেক স্থানে ভূপৃষ্ঠের অতি অল্প নীচেই জল পাওয়া যায়, এমন কি ১৫।২০ ফুট খুঁড়িলেই কূপ উৎপন্ন হইতে পারে। এরূপ **অগভীর কূপ** মাটির মধ্যে একটি গর্ত মাত্র। চারিধারের জমির উপরের জল গড়াইয়া গিয়া ক্রমে ইহাতে প্রবেশ করে।
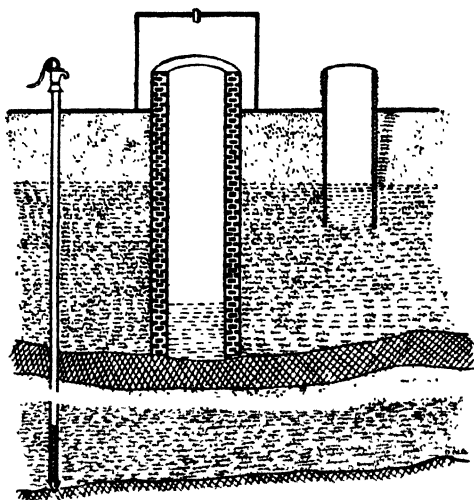
টিউব-ওয়েল গভীর কূপ অগভীর কূপ

পল্লীগ্রামে সচরাচর **পুষ্করিণীর** জল পান করিবার ও অন্যান্য কার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উহা সহজেই দূষিত হয় বলিয়া পান করা নিরাপদ নহে। পানীয়রূপে ঐ জল ব্যবহার করিতে হইলে যত্নসহকারে উহা রক্ষা করা আবশ্যক।

কোন কোন স্থানে **বৃষ্টির জল** সঞ্চিত করিয়া তাহাতেই জলের অভাব মিটান হয়। বৃষ্টির জল নির্মল হইলেও পতনকালে

বায়ুস্থিত ভাসমান ধূলা, ময়লা দ্বারা কলুষিত হইতে পারে। বৃষ্টি হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হইলে, উহা উন্মুক্ত প্রান্তরে বা উচ্চ ছাদের উপরে নির্মল পাত্রে পরিষ্কার কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বড় বড় শহরের ব্যবহার্য জল নদী হইতে সংগৃহীত ও পানোপযোগী করিয়া লওয়া হয়। নদী হইতে পাম্প দ্বারা জল তুলিয়া প্রথমে থিতান হয় এবং তাহার পর ফিল্টারের ভিতর দিয়া বিশোধন করিয়া লইবার পর, সেই নির্মল জল নলের ভিতর দিয়া সর্বত্র সরবরাহ করা হয়। ইহা বহু ব্যয়সাপেক্ষ এবং বড় বড় শহরেই সম্ভব। যেখানে এইরূপ কলের জল পানীয়রূপে প্রচলিত হইয়াছে, সেখানে কূপ বা পুকুরের দূষিত জল পান করা কাহারও উচিত নয়।

অষ্টম অধ্যায়

দূষিত জল ও তজ্জনিত ব্যাধি

দূষিত জল।—পানীয় জল নির্মল ও বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যদি জলে ধূলা কাদা, রোগের জীবাণু বা অনিষ্টকর কোন পদার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দূষিত জল বলা হয়। জলে ধূলাকাদা প্রায়ই থাকে; ঐ জল কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে ধূলাকাদা তলায় পড়িয়া যায় এবং তখন জল পরিষ্কার দেখায়। কিন্তু পরিষ্কার দেখাইলেও কখন কখন জলে অতিরিক্ত পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। মেঘ হইতে যে জল পড়ে তাহা বিশুদ্ধ। ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া উহার কিয়দংশ উপর দিয়া গড়াইয়া সাগরাভিমুখে চলিয়া যায় এবং কিয়দংশ ভিতরে চোয়াইয়া মাটিতে প্রবেশ করে। সমুদ্রের দিকে যাইবার পথে ঐ জল ভূমিস্থ পলি-মাটি, এঁটেল মাটি, খড়ি, চুন, কাঁকর, বেলেপাথর ও নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের সংশ্রবে আসে। তখন ঐ সকল পদার্থেরও কিছু কিছু জলে মিশিয়া যাওয়ায় জল অবিশুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই জলে সাবান গুলিলে সহজে ফেনা হয় না এবং ইহাতে রান্নাও ভাল হয় না। এরূপ জলকে "খর" জল (hard water) বলা হয়। এই জল পানে কোষ্ঠকাঠিন্য ও পরিপাকের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। রাসায়নিক দ্রব্য না থাকিলে বা অত্যন্ত কম থাকিলে সে জলে সহজেই সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয়; তাহাকে "মৃদু" জল (soft

water) বলা হয় ইহার ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক এবং ইহা রান্নার কাজের পক্ষে উপযোগী।

জল দেখিতে নির্মল হইলেও তাহাতে অনেক জীবাণু অদৃশ্যভাবে থাকিতে পারে। এই সকল জীবাণু এত ক্ষুদ্র যে শুধু চোখে তাহাদিগকে দেখা যায় না; সেজন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল নির্মল বিবেচিত হইলেও তাহাতে
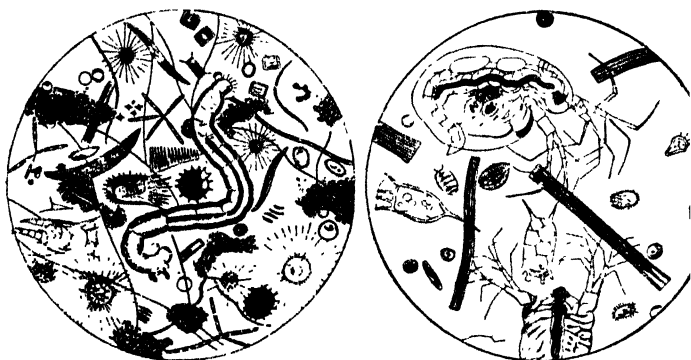
অণুবীক্ষণের সাহায্যে দূষিত জলে যাহা দেখা যায়

মারাত্মক রোগের জীবাণু থাকিতে পারে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে দূষিত জলের ভিতর কত প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সন্নিবেশিত চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে।

জল কিরূপে দূষিত হয়।—অগভীর কূপের জল সহজেই দূষিত হইয়া পড়ে। বাংলাদেশের অধিকাংশ কূপই অগভীর। চতুঃপার্শ্বের দূষিত জল গড়াইয়া এই সকল কূপে প্রবেশ করে। আবার মাটি নরম বা 'বেলে' হইলে তাহার ভিতর দিয়া দূষিত তরল পদার্থ সহজেই চোয়াইয়া কূপে যাইয়া পড়ে। কূপের পাড়ের গাঁথনি

খারাপ বা ভগ্ন হইলে দূষিত জল সহজেই ভিতরে প্রবেশ করে। পাশে গোরস্থান, পায়খানা, নর্দমা, ময়লা জলের গর্ত্ত, পশুশালা বা আস্তাবল থাকিলেও ঐ সকল স্থানের ময়লা জল কূপে যাইয়া মিশে। অনাবৃত কূপে খড়-কুটা, ধুলা, ময়লা, পক্ষীর বিষ্ঠা ইত্যাদি প্রায়ই পড়ে। ইহা ছাড়া লোকে কূপের নিকট দাঁড়াইয়া স্নান করে, নোংরা কাপড় কাচে, ময়লা বাসন মাজে এবং ময়লা দড়ি দিয়া অপরিষ্কার

অণুবীক্ষণের সাহায্যে দূষিত জলে যাহা দেখা যায়

বালতি বা কলসি ডুবাইয়া কূয়া হইতে জল তোলে। এইরূপ নানাকারণে কূপের জল দূষিত হয়।

কূপ অপেক্ষা পুকুরের জল আরও সহজে দূষিত হইয়া পড়ে। প্রায়ই তাহাতে লতাপাতা পড়িয়া পচে। অনেকে পুকুরের ধারে পায়খানা নির্মাণ করে এবং পুকুরের পাড়ের উপর মল-মূত্র ত্যাগ করে। গোয়াল ঘরের জল ও নর্দমার পচা জল ইত্যাদি অনেক সময়ে পুকুরে যাইয়া পড়ে। পুকুরের জলে ময়লা কাপড় কাচা হয়।
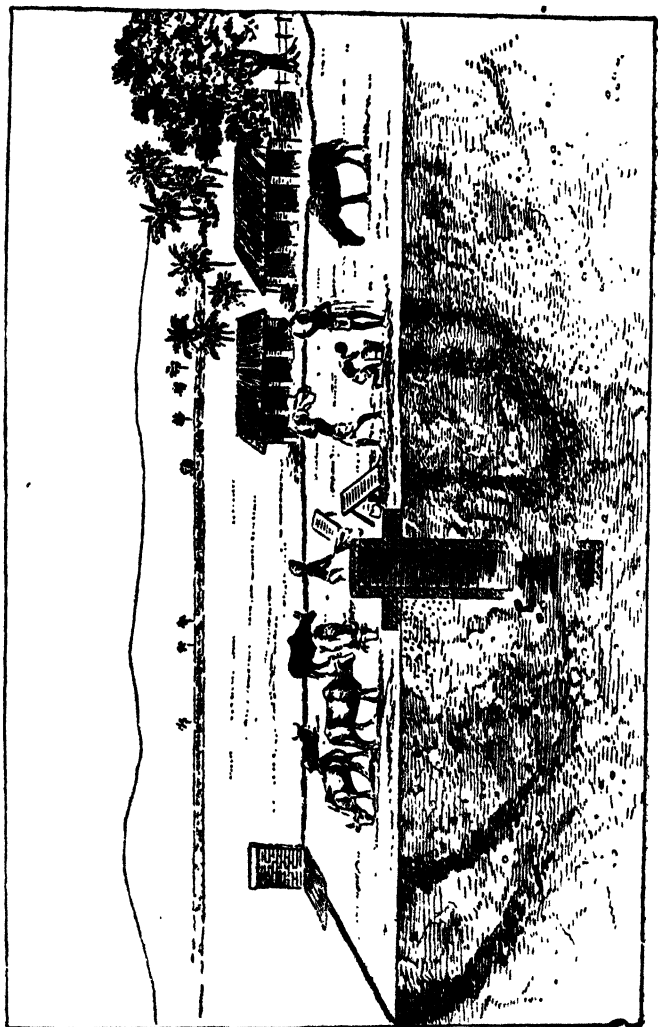
কূপের জল কিরূপে অপরিষ্কার হয়

শত শত লোক পুকুরে নামিয়া স্নান করে; এমন কি, গো-মহিষও বাদ যায় না। অনেকে আবার জলে নামিয়া দাঁত মাজে ও মুখ ধোয় এবং জলে থুথু, কফ, শ্লেষ্মা ফেলে। মেয়েরা শিশুদের মল-মূত্র-মাখা কাপড় পুকুরের জলে ডুবাইয়া কাচিয়া লয়। কেহ কেহ পুকুরে নামিয়া অবাধে শৌচ-প্রস্রাবাদিও করিয়া থাকে। এই সকল কারণে পুকুরের জল বিষতুল্য হয়।

পুষ্করিণীর জল যেরূপে দূষিত হয় নদীর জলও সেইরূপে দূষিত হয়। এতদ্ব্যতীত নদীতে লোকে জীবজন্তুর মৃতদেহ ফেলে, তীরস্থিত কলকারখানার ময়লা তাহাতে পড়ে এবং তীরের অধিবাসীদের মল-মূত্রাদি প্রায়ই উহাতে নিক্ষিপ্ত হয়। কখন কখন নদীতে প্রভূত পরিমাণে পাট ভিজান হয়। নৌকা স্টীমার প্রভৃতির ময়লা নদীতে পড়ে এবং মাঝিরা জলে মলমূত্র ত্যাগ করে। এইরূপে নদীর জল কিরূপ দূষিত হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দূষিত নদীর জল বহুদূর অবধি বিস্তৃত হইয়া কখন কখন মহামারীর সৃষ্টি করে। অতএব শোধন না করিয়া নদীর জল পান করা উচিত নহে।

দূষিত জল হইতে ব্যাধি।—নানাবিধ রোগের জীবাণু দূষিত জলের মধ্যে পাওয়া যায় এবং সেই দূষিত জল পান করিলে জীবাণুগুলি দেহে প্রবেশ করিয়া রোগের সৃষ্টি করে। কলেরা, আমাশয় উদরাময়, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি অনেকস্থলে এইরূপেই উৎপন্ন হয়। মানুষ ও জীবজন্তুর বিষ্ঠার সহিত নানাপ্রকার ক্রিমি কীট ও উহাদের ডিম্ব বাহির হইয়া যায়। সেগুলি পুষ্করিণী বা কোন জলাশয়ে পড়িলে সেই জলের সহিত মানুষের পাকস্থলীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। ফিতা-ক্রিমি (tape worm), কেঁচো-ক্রিমি

(round worm), সূতা-ক্রিমি (thread worm) ইত্যাদি বহুবিধ ক্রিমির ডিম্ব এইরূপে আমাদের শরীরে প্রবেশ লাভ করে।

পানীয় জল দূষিত হওয়ায় কলেরা ব্যাধির উৎপত্তি হয় তাহা তোমরা সকলেই জান। বাংলাদেশে প্রায়ই কলেরা রোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। যখন যেখানে ইহার প্রাদুর্ভাব হয় সেখানে অল্পকালের মধ্যে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গ্রীষ্মের সময় পুষ্করিণী, খাল ইত্যাদি শুকাইয়া যাওয়ায় অত্যন্ত জলকষ্ট উপস্থিত হয়। গ্রামবাসীরা তখন দূষিত জল পান করিয়া প্রায়ই কলেরা দ্বারা আক্রান্ত হয়। অধুনা নলকূপের প্রচলন হওয়ায় কলেরার প্রকোপ অনেক কমিয়া যাইতেছে। অনেক শহরে কলের জল প্রচলিত হওয়ায় কলেরা রোগীর সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমাশয়, উদরাময়, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতিও দূষিত জল হইতে উৎপন্ন হয়। একই বাড়ীতে বা পল্লীতে অনেকে একই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, কোন কূপ বা পুষ্করিণীর দূষিত জল পান করিয়াই এরূপ হইতেছে।

নির্ম্মল জল পাইবার উপায়।—কূপের জলের উপর নির্ভর করিতে হইলে কূপটি পাকা করিয়া গাঁথাইবে এবং তাহার দেওয়াল সিমেণ্ট দিয়া বাঁধাইয়া দিবে। কূপের জল যাহাতে দূষিত না হইতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। নির্দিষ্ট পাত্র ব্যতীত বালতি বা কলসি কূপে ডুবাইতে দিবে না। কূপ আবৃত রাখিয়া পাম্পের সাহায্যে জল তোলার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়।

অধুনা নলকূপের প্রচলন বাড়িতেছে। বাংলাদেশে উহার সংখ্যা

যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল ; কারণ নলকূপের জল নির্মল ও তাহা দূষিত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। নলকূপ দিয়া ভূগর্ভের যে সুগভীর প্রদেশ হইতে জল টানিয়া তোলা হয়, সেখানে বাহিরের ময়লা ভূপৃষ্ঠের ভিতর দিয়া চোয়াইয়া পৌঁছিতে পারে না।

পুষ্করিণীর জল পানীয়রূপে ব্যবহার করিতে হইলে একটি পুষ্করিণী সেজন্য সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখা দরকার। প্রত্যেক পল্লীতে পানীয় জলের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ পুষ্করিণীকে "রিজার্ভ ট্যাঙ্ক" (reserve tank) বলা হয়। ঐ পুষ্করিণীর জলে কেহ নামিবে না। পুষ্করিণীর চতুর্দিকে বেড়া দিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে কোন জন্তু জানোয়ারও ধারে না আসিতে পারে। জল তুলিতে অপরিষ্কার কলসি বা বালতি ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নয় এবং ঐ জলে কাহাকেও হাতমুখ ধুইতে বা পা ডুবাইতে দিবে না। ঐ পুষ্করিণীতে ঘাট না রাখিয়া জল তোলার জন্য মাচা করিয়া দিলে ভাল হয় ; মাচার উপর হইতে সকলে জল তুলিবে। পাম্প বসাইয়া জল তোলার ব্যবস্থা করিলে আরও ভাল হয়। নিকটে নর্দমা, পায়খানা, আঁস্তাকুড়, গোয়ালঘর যাহাতে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বর্ষাকালে বাহির হইতে ময়লা জল যাহাতে পুষ্করিণীতে ঢুকিতে না পারে সেজন্য পুষ্করিণীর পাড় উঁচু এবং বাহির দিকে ঢালু করিয়া দেওয়া দরকার। পাড়ে গাছপালা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয় এবং যাহাতে জলের উপর সারাদিন রৌদ্র পড়ে ও বায়ু চলাচলের বাধা না হয় তাহারও ব্যবস্থা করা দরকার।

নবম অধ্যায়

জল বিশোধন

বিশুদ্ধ জল।—পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, সম্পূর্ণ নির্দোষ পানীয় জল পাওয়া বড়ই কঠিন। নানা কারণে জল সহজেই দূষিত হইয়া পড়ে। মেঘ হইতে যে বৃষ্টির জল পড়ে, যদি তাহা বিশেষ সাবধানতা সহকারে সংগ্রহ করা যায় এবং বায়ু হইতে যে সকল ময়লা তাহাতে আসিতে পারে তাহা নিবারণ করা যায়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ জল পাওয়া সম্ভব। সাধারণত উৎস বা ঝরণা হইতে যে জল উঠে তাহাও নির্মল ও বিশুদ্ধ। ভূগর্ভে নলকূপ প্রোথিত করিয়া উহার সুগভীর নিম্ন প্রদেশ হইতে যে জল পাম্প করিয়া বাহির করা হয় তাহাও নির্দোষ। যাহাহউক, নিম্নলিখিত উপায়ে জলের বিশুদ্ধতা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(১) **স্বাভাবিক নিয়মে**।—সূর্যের কিরণ অবাধে জলের উপর কিছুকাল পড়িলে সেথায় জীবাণুগুলি বিনষ্ট হয় এবং এইরূপে দূষিত জল বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ বায়ু হইতেও জল কিয়ৎ পরিমাণে বিশোধিত হয়। সেজন্য পুষ্করিণীর জলের উপর যাহাতে সদাসর্বদা বায়ু বহিয়া যাইতে পারে এবং অবাধে রৌদ্র পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। পুষ্করিণীর শ্যাওলা হইতে জলের বিশোধনে সাহায্য হয়; আবার মৎস্যাদি অনেক ময়লা খাইয়া ফেলে বলিয়াও জলের কতক দোষ কাটিয়া যায়।

(২) **অগ্নির উত্তাপে**।—আগুনে ফুটাইয়া সিদ্ধ করিলে অতি দূষিত জলও বিশুদ্ধ হইয়া যায়। এজন্য অন্তত ১৫ মিনিটকাল জল ফুটান আবশ্যক। পানীয় জল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করিবার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। জল কেবল গরম করিলেই সকল দোষ নষ্ট হয় না, রোগের কারণগুলি সম্যক্ নষ্ট করিতে হইলে জল বেশ করিয়া ফুটান দরকার। সিদ্ধজল খাইতে বিস্বাদ লাগে, কিন্তু কিয়ৎকাল ঢালাঢালি করিয়া তাহার সহিত বায়ু মিশ্রিত হইতে দিলে জলের পূর্ব স্বাদ শীঘ্র ফিরিয়া আসে। গরম জলের পাত্র কিছুক্ষণ হাওয়ায় রাখিয়া দিলেও বিস্বাদ দূর হইয়া যায়। ঘোলা জল পান করিয়া অসুখ হইলেও ফল সেরূপ মারাত্মক হয় না, কিন্তু জলে যদি রোগের জীবাণু থাকে তাহা হইলে উহা পান করিয়া মৃত্যু হইতে পারে। অতএব পানীয় জলের জীবাণু সম্পূর্ণ ধ্বংস করা একান্ত প্রয়োজন, এবং তাহা সাধন করিতে হইলে জল সিদ্ধ করাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এইজন্য কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে সকলকে পানীয় জল সিদ্ধ করিয়া পান করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। পানীয় জল বার মাস ফুটাইয়া পান করা অতি উত্তম প্রথা এবং সম্ভব হইলে, তাহা পালন করিবে। শহরে বিশুদ্ধ জল পাওয়া গেলেও, তাহা ফুটাইয়া পান করিলে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া যায়।

(৩) **বিশোধক দ্রব্য মিশাইয়া**।—কূপের অথবা পুষ্করিণীর জল দূষিত হইলে তাহাতে বীজঘ্ন ঔষধ মিশাইয়া শোধন করা যাইতে পারে। এজন্য পটাস পারমাঙ্গানেট, তুঁতে, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অল্প পরিমাণ ফটকিরি

মিশাইলেও জলের মাটি-কাদা শীঘ্র তলায় পড়িয়া যায়। বিশোধক দ্রব্যগুলি এমনভাবে দিতে হয় যেন সমস্ত জলে উহা মিশিতে পারে। শোধনের দুই তিন দিন পরে জল পরিষ্কার হইয়া যায় এবং তখন তাহা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এই উপায়ে শোধিত জল যে সম্পূর্ণ নিরাপদ তাহা বলা যায় না।

(৪) **ফিল্টারের সাহায্যে।**—জল শোধন করিবার জন্য ফিল্টার যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত আছে। কিন্তু কি করিয়া ফিল্টার প্রস্তুত করিতে হয়, কি করিয়া তাহাতে জল বিশোধিত হয়, এবং কি ভাবে উহার কার্য রীতিমত সম্পাদিত হইতে পারে, এ সকল জানা না থাকিলে ফিল্টার ব্যবহারে অনেক সময় অনিষ্ট হইয়া থাকে।

ফিল্টার

আমাদের দেশে যে ফিল্টার সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহাতে কলসির ভিতর কয়লা, বালি, কাঁকর ও পাথর রাখা হয়। কলসির নিম্নে ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে ও তাহার ভিতর দিয়া জল গড়াইয়া নীচের কলসিতে পড়ে। বাঁশ বা কাঠের একটি ফ্রেমে তিন বা চারিটি কলসি, একটির উপর আর একটি, বসাইয়া উহা প্রস্তুত করা হয়। বালির
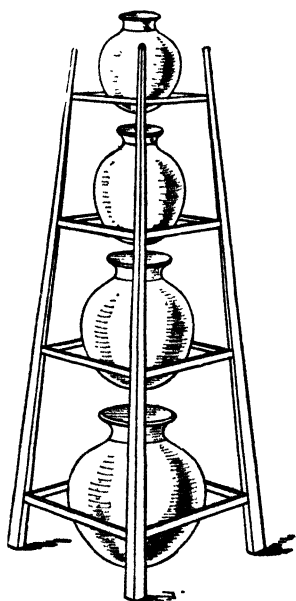
ভিতর দিয়া চোয়াইয়া জল পরিষ্কৃত হয় বটে, কিন্তু ঐ বালির উপরিভাগে শ্যাওলার ন্যায় যে উদ্ভিজ্জ পদার্থ জন্মে তাহার উপরেই জলের বিশোধন অনেকটা নির্ভর করে। ফিল্টার ব্যবহার করিবার অল্পদিনের মধ্যেই এই শ্যাওলা জন্মে। পরে উহা এমন পুরু হয় যে, জল তাহার ভিতর দিয়া আর যাইতে পারে না। তখন এই শ্যাওলার কতকটা ফেলিয়া দেওয়া দরকার হয়, কিন্তু এই শ্যাওলা না জন্মিলে বালির ভিতর দিয়া চোয়ান জল পান করা নিরাপদ নহে।

কতকগুলি বিলাতি ফিল্টারের আজকাল প্রচলন হইয়াছে। তন্মধ্যে বার্কফিল্ড ফিল্টার ও পাশ্চর-চেম্বারলেন ফিল্টার উল্লেখযোগ্য। উহাদের ভিতরে বিশেষ ভাবে নির্মিত ফাঁপা নল বসান থাকে। এই নলগুলি ভঙ্গপ্রবণ, দামও নিতান্ত কম নয়, এবং মাঝে মাঝে জলে ফুটাইয়া লইতে হয়। সাবধানে ব্যবহার করিলে ও সর্বদা পরিষ্কার রাখিতে পারিলে এগুলি হইতে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এত সাবধানতা সব সময়ে সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশে যে বেলেমাটির কলসি পাওয়া যায় তাহা অপরিষ্কার জলের ভিতর চাপিয়া বসাইয়া রাখিলে উহার গাত্র ভেদ করিয়া জল আস্তে আস্তে কলসির ভিতরে জমে। এই জল বেশ পরিষ্কার হয়। এইরূপ কাজের জন্য কতকগুলি বিলাতি বোতল-ফিল্টার ব্যবহৃত হয়; সেগুলি জলের মধ্যে বসাইয়া রাখিলে ভাল জল ভিতরে যাইয়া জমে। কিন্তু এইরূপে পরিষ্কৃত জলও নিরাপদে পান করা যায় না।

দশম অধ্যায়

শহর ও পল্লীগ্রামে জল সংরক্ষণ ও সরবরাহ

গৃহকার্যের জল।—পানীয় জল ব্যতীত রন্ধন, স্নান, কাপড়-কাচা, ঘর-ধোয়া, বাসন-মাজা ইত্যাদি নানা কার্যের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থকে জল সংগ্রহ করিতে হয়। অনেকের ধারণা যে পানীয় জলের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিলেই সকল দায়িত্ব শেষ হইয়া গেল, অন্যান্য কার্যের জন্য যে কোন জল ব্যবহার করা যাইতে পারে। এরূপ ভাবা অন্যায়। ময়লা জলে বাসন মাজিলে, কাপড় কাচিলে বা ঘর ধুইলে জলের দূষিত পদার্থ ঐসব জিনিসে লাগিয়া যায় এবং এইরূপে রোগের বিস্তার হইতে পারে। পানীয় জলের জন্য যেমন পদে পদে সাবধান হইতে হয়, অন্য জলের জন্য ততটা আবশ্যক না হইলেও, ময়লা বা অবিশুদ্ধ জল গৃহকার্যে ব্যবহার করা উচিত নহে।

তোলা জল।—আবশ্যক পরিমাণ জল তুলিয়া ও নির্বীজন করিয়া প্রয়োজন মত একাধিক পাত্রে রাখিতে হয়। দরকার হইলেই পুষ্করিণী বা কূপ হইতে জল তুলিয়া আনিয়া তাহা তখনই শোধন করিয়া ব্যবহার করা সুবিধাজনক নহে। পাত্রের জন্য মাটির জালা, কলসি, লোহার টব বা ট্যাঙ্ক কিংবা সিমেণ্ট করা পাকা চৌবাচ্চা ব্যবহার করা যায়। পাত্রে জল রাখিলে উহার ময়লা থিতাইয়া অনেক পরিমাণে নীচে পড়িয়া যায়। থিতাইবার

পর পানীয় জল কলসিতে পূরিয়া আগুনে ফুটাইয়া লইবে। ১৫ মিনিট ফুটাইয়া বিশুদ্ধ করিবার পর জল সুবিধাজনক পাত্রে রাখিয়া, পরিষ্কার কাপড় দিয়া বা অন্য প্রকারে, উহার মুখে ঢাকা দিবে। ফুটান জল ঠাণ্ডা না হইলে খাইতে বিস্বাদ লাগে। সেজন্য অন্তত দুইটা পাত্র রাখা উচিত; একটির জল ঠাণ্ডা হইতে হইতে অন্যটি হইতে শীতল জল পান করা চলিবে।

আমাদের প্রায় সকলের বাড়ীতেই কুঁজার ব্যবহার দেখা যায়। কুঁজার মুখ অপ্রশস্ত হওয়ায় উহার ভিতর ভাল করিয়া ধৌত করা যায় না, কিন্তু ইহার সুবিধা এই যে উহার জলে শীঘ্র ময়লা পড়ে না বা কেহ কিছু ডুবাইতে পারে না। জালা ও কলসির প্রশস্ত মুখের ভিতর প্রায়ই লোকে হাত, ঘটি, ভাঁড় ইত্যাদি ডুবাইয়া ময়লা করে।

রন্ধনে ব্যবহৃত জল আগুনে ফুটিয়া বিশুদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অবিশুদ্ধ জল রান্নাঘরে রাখিবে না। কখন কিভাবে তাহার ব্যবহার হইয়া পড়ে, তাহা বলা যায় না; এজন্য রান্নাঘরে বিশুদ্ধ জল রাখাই কর্তব্য।

পিতল বা কাঁসার ঘড়া অথবা টিনের কানেস্তারেও জল রাখা চলে। ভিস্তির মশকে করিয়া জল আনার ব্যবস্থা স্বাস্থ্যানুমোদিত নহে, কারণ উহাতে ময়লা জমে।

গৃহে কলের জলের ব্যবস্থা থাকিলেও সর্বদা কলে জল থাকে না। অতএব অনেক বাটীতে ছোট ছোট চৌবাচ্চা বা বড় বড় টবে জল তুলিয়া রাখা হয়। ঐ জলাধারগুলি অপরিষ্কার হইলে জল দূষিত হইয়া পড়ে। কোন বাড়ীতে বহুলোকের নিমন্ত্রণ হইলে

পূর্বেই জল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। কখন কখন ঐ জল অপরিষ্কার পাত্রে অথবা ঢাকা না দিয়া রাখা হয়। অনেকে আবার সেই জলে হাত ডুবায় ও যদৃচ্ছা ব্যবহার করে। তাহাতে জল দূষিত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ক্রিয়াকর্মের সময় এবিষয়ে প্রত্যেক গৃহস্থের সাবধান হওয়া কর্তব্য।

কলের জল।—অতি অল্পসংখ্যক শহরে এক্ষণে কলের জলের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ক্রমশ ইহার প্রবর্তন হইতেছে এবং ছোট ছোট শহরেও সেজন্য উদ্যম উদ্যোগ চলিতেছে। কলের জল সরবরাহের জন্য প্রায়ই নদী হইতে পাম্প করিয়া জল তুলিয়া লওয়া হয়। সে জল প্রায়ই ঘোলা থাকে। অতএব সর্ব প্রথমে তাহা হইতে কাদা, মাটি ও অন্যান্য আবর্জনা দূর করিতে হয়। ইহার জন্য কয়েকটি পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া জল থিতাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই পুষ্করিণীগুলিকে এভাবে স্থাপিত ও পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় যে, জল একটির পর আর একটি পুষ্করিণীর ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে প্রবাহিত হইয়া শেষটিতে পড়িয়া জমিতে পারে। ঐরূপে প্রবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জলের কাদা মাটি ও অন্যান্য আবর্জনা পুষ্করিণীগুলির তলায় পড়ে এবং শেষের পুষ্করিণীতে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। এই প্রণালীতে জল পরিষ্কার করার ব্যবস্থায় প্রথম পুষ্করিণীটি শীঘ্রই কাদা মাটিতে পূর্ণ হইয়া যায়। তখন উহাতে জল তোলা বন্ধ করিয়া তলার কাদামাটি বাহির করিয়া দিতে হয়। পরবর্তী পুষ্করিণীগুলিতেও কাদা মাটি জমে এবং মাঝে মাঝে উহাদিগকে পরিষ্কার করিতে হয়।

কাদামাটি তলায় পড়িয়া গেলে ঐ জল পুষ্করিণী হইতে

ফিল্টারের উপর চালাইয়া দিতে হয়। ফিল্টারের উপর ঐ পুষ্করিণীর জল যাহাতে আপনি গড়াইয়া প্রবেশ করিতে পারে সেজন্য পুষ্করিণীগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে তৈয়ারী করিতে হয়। কলিকাতায় পলতা নামক স্থানে ভাগীরথির পূর্ব তীরে বিস্তৃত ভূমির উপর কতকগুলি পুষ্করিণীর ভিতর জল পরিষ্কার করার পূর্বোক্ত ব্যবস্থা আছে। পাম্প হইতে জল যখন পুষ্করিণীতে পড়ে, তখন জলে ফেরো-অ্যালম নামক রাসায়নিক পদার্থ মিশান হয়। তাহাতে জলের কাদামাটি অতি শীঘ্র তলায় পড়িয়া যায়। তারপর কয়েকটি পুষ্করিণীর ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে জল গড়াইয়া যখন শেষের পুষ্করিণীতে প্রবেশ করে, তখন তাহা ধীরে ধীরে ফিল্টারের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কলিকাতার পানীয় জলের জন্য এই ফিল্টারের বন্দোবস্ত একটি বিরাট ব্যাপার। সেখানে বেড়াইতে গেলে আনন্দ ও শিক্ষা দুই লাভ করা যায়।

ফিল্টারগুলির উপরে বালি এবং নিম্নে কাঁকর ও খোয়ার স্তর সাজান থাকে। এই ফিল্টারের উপর একপ্রকার শ্যাওলা জন্মে এবং বালির উপর তাহার একটা স্তর পড়িয়া যায়। এই স্তরটি জল শোধনে বিশেষ সহায়তা করে। সর্বপ্রকার জীবাণু ও জান্তব পদার্থ ঐ স্তরে আটকাইয়া যায় এবং নীচে নামিতে পারে না; কিন্তু জল তাহা ভেদ করিয়া নামিয়া যায়। ইহার পর অন্যান্য স্তর ভেদ করিয়া জল গড়াইতে গড়াইতে বড় বড় চৌবাচ্চার ভিতর আসিয়া জমে।

শহরে পানীয় জলের ব্যবস্থা।—ফিল্টার হইবার পর যে জল বড় বড় চৌবাচ্চার ভিতরে যাইয়া জমে তাহা বিশুদ্ধ।

কিন্তু উহার বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী বিতরণ করা নিতান্ত সহজ কার্য নহে। এই জল চৌবাচ্চায় থাকার সময় ভূপৃষ্ঠের ময়লা জল চোয়াইয়া বা অন্য কোন প্রকারে দূষিত হইতে পারে। সেইজন্য অতি সাবধানে এই জল রক্ষা করিতে হয়।

অনেক শহরে ফিল্টার করা বিশুদ্ধ জল পাম্পের সাহায্যে উচ্চে স্থাপিত লৌহনির্মিত বড় বড় ট্যাঙ্ক বা জলাধারে তুলিয়া দেওয়া হয়। পরে সেই জল ট্যাঙ্ক হইতে পাইপের ভিতর দিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও লোকের বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করা হয়।

কলিকাতায় টালা নামক স্থানে মাটির নীচে বিরাট চৌবাচ্চা বা জলাধার নির্মিত হইয়াছে। পলতা হইতে জল আসিয়া সেখানে জমে। এই জলাশয় সুরক্ষিত এবং তাহার ভিতর বাহিরের ময়লা যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য ব্যয়ের ক্রটি করা হয় নাই। ঐ জলাধার হইতেই পানীয় জল কলিকাতায় সর্বত্র প্রেরিত হয়।

টালার জলাধারের সংলগ্ন প্রভূত শক্তিসম্পন্ন বৃহৎ বৃহৎ পাম্প আছে এবং তাহাদেরই সাহায্যে লৌহনির্মিত পাইপের ভিতর দিয়া শহরের সর্বত্র জল সরবরাহ করা হয়। এই টালা পাম্পিং স্টেশনের একাংশে এঞ্জিনিয়ার ম্যাকেব সাহেবের উদ্ভাবিত শতফুট উচ্চ "টালা ট্যাঙ্ক" নামে বিখ্যাত লৌহনির্মিত জলাধার আছে। অনেকের ধারণা এই যে, সমুদয় জল ঐ উচ্চ ট্যাঙ্কে তুলিয়া দিবার পর অভিকর্ষ শক্তির সাহায্যে তাহা কলিকাতার সর্বত্র যাইয়া পড়ে। ইহা ঠিক নহে। দেখিতে পাওয়া যায় যে

একই মাত্র পাইপ দিয়া ঐ ট্যাঙ্কে জল উঠে বা নামে এবং শহরের জলের পাইপের ভিতরের চাপের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ট্যাঙ্কের জল কমে ও বাড়ে। বাস্তবিক কলিকাতায় যত জল ব্যবহৃত হয় সবই টালার ঐ উচ্চ ট্যাঙ্কের ভিতর উঠে না। কতকটা জল মাত্র তাহাতে উঠে; কিন্তু বেশি জলই পাম্পের সাহায্যে মাটিতে অবস্থিত জলাধার হইতে পাইপের ভিতর দিয়া সোজাসুজি শহরের ভিতর পাঠাইয়া দেওয়া হয়। জলের যে অংশ টালার ঐ উচ্চ ট্যাঙ্কে উঠে তাহা অভিকর্ষ শক্তির সাহায্যে মাঝে মাঝে পাইপের ভিতর দিয়া নামিয়া শহরে প্রবেশ করে। তাহাতে পাইপের ভিতর চাপ রক্ষার ব্যবস্থার সুবিধা হয়।

লৌহ পাইপের ভিতর দিয়া পানীয় জল শহরের সর্বত্র প্রেরণ করা হয়। এই পাইপগুলিতে কোন ছিদ্রাদি থাকিলে তাহার ভিতরে বাহিরের ময়লা প্রবেশ করিতে পারে। পাইপের মধ্যে জলের চাপ কম হইয়া গেলে মাটির তরল ময়লা পাইপের ভিতর প্রবেশ করিবার বেশ সুবিধা পায়; কিন্তু পাইপের ভিতর জলের চাপ বেশি থাকিলে ঐ ময়লা প্রবেশ করিতে পারে না। যেখানে পাইপগুলি দিবারাত্র জলে ভরা থাকে না, সেখানে বাহিরের ময়লা পাইপের ছিদ্রের ভিতর দিয়া সহজে জলে প্রবেশ করিতে পারে।

পল্লীগ্রামে জলের ব্যবস্থা।—শহরে সমবেতভাবে যেরূপ বিস্তৃত ব্যবস্থা করা যায়, পল্লীগ্রামে তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে বাস করিতে হইবে সেখানে জলের সুবন্দোবস্ত করিতেই হইবে, নতুবা নিরাপদে বাস করা অসম্ভব। শহরে কলের জল প্রবর্তিত হইবার পর কলেরা, আমাশয়, উদরাময় ইত্যাদি

ব্যাধির প্রাতুর্ভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। জলের সুবন্দোবস্ত করিলে পল্লীগ্রামেও সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করা যাইতে পারে এবং এই সকল ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আজকাল পল্লীগ্রাম ছাডিয়া শহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার একটি প্রধান কারণ পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ জলের অভাব। শিক্ষিত লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়াতে পল্লীগ্রামের উন্নতির সম্ভাবনা চলিয়া যাইতেছে। গ্রাম ত্যাগ না করিয়া, গ্রামের যাহাতে উন্নতি হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাব দূর হয় তাহাই তাঁহাদের করা কর্ত্তব্য। যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অথবা মিউনিসিপালিটি আছে, সেখানে 'রিজার্ভ ট্যাঙ্কের' বন্দোবস্ত অল্প আয়াসেই করা যায়। ঐরূপ ট্যাঙ্ক বা পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া ব্যবহার করিলে এবং পান করিবার পূর্বে ফুটাইয়া লইলে অনেক বিপদ দূর হয়। ইহা ছাড়া নলকূপের সাহায্যে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাইতে পারে। নলকূপ নির্মাণের খরচও আজকাল কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসাইলেই গ্রামের পানীয় জলের সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে।

একাদশ অধ্যায়

শহর ও গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা

সমবেত কাজ।—শহরেই হউক আর পল্লীগ্রামেই হউক, যেখানে অনেক লোক একত্র বাস করে সেস্থানের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক। বহুলোকের একত্র বাসে কতকগুলি এমন বিষয়ের উদ্ভব হয় যাহা ব্যক্তিগতভাবে সমাধান করা অসম্ভব। এজন্য মিউনিসিপালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মতামত লইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক নানাবিধ হিতকর ব্যবস্থার প্রবর্তন ও পরিচালন করা হয়। স্বায়ত্তশাসনের ইহাই মূলতত্ব বলা যাইতে পারে। বাংলাদেশে বহুস্থানে ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে। সাধারণের ভিতর হইতে সুযোগ্য কর্মিষ্ঠ লোক বাছিয়া লইয়া কাজ করিতে পারিলে সুফল লাভ করিবারই কথা। বাস্তবিক পৃথিবীর সর্বত্র সুসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপ উপায়ে নিজ নিজ বাসস্থানের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহার ফলে বহু লোক একত্রভাবে নিরাপদে ও আনন্দে কাল কাটাইতেছে।

দুর্ভাগ্যবশত বাংলা দেশের অধিকাংশ পল্লীগ্রামই অস্বাস্থ্যকর এবং তাহা নিবারণের জন্য যে প্রয়াস, যত্ন ও সমবেত চেষ্টা আবশ্যক তাহার অভাব রহিয়াছে। বড় বড় শহরে কর্তৃপক্ষ ও নাগরিকদের

চেষ্টায় স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে অনেক সমবেত ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক পল্লীগ্রামেই বাস করে; সেজন্য গ্রামের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সত্য বটে যে, শহরে যাহা সম্পাদন করা সম্ভব তাহা ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে করা কঠিন। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যাহা পল্লীবাসীরা অল্প চেষ্টায় সম্পাদন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে।

কর্তৃপক্ষকে সাহায্য।—সর্বত্র সুসভ্য জাতিরা স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশে নানাবিধ আইন ও নিয়মাদি প্রচলিত করিয়াছে। যাহাতে ব্যক্তিগত ইচ্ছায় কাজ করিয়া কেহ সমাজের বা রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে, সেজন্য সর্বত্রই নানাবিধ নিয়ম আছে এবং তাহা লঙ্ঘনে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। ইহা না থাকিলে সমবেতভাবে কার্য করা কঠিন এবং একজনের দোষ বা অবিবেচনায় বহু লোকের বিপদ ঘটিতে পারে। কি শহর, কি পল্লীগ্রাম সর্বত্রই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক আইন ও নিয়মাদি পালন করা উচিত। কর্তৃপক্ষীয়দের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে এবং নিজেরা আইন ও নিয়মাদি পালন করিয়া অন্য সকলকে পালন করিতে শিখাইবে। স্বাস্থ্যরক্ষায় নিযুক্ত কর্মচারীরা যেরূপ উপদেশ দেন বা আদেশ করেন তাহা হিতকর জানিয়া মান্য করিয়া লইবে। যখন তাঁহারা বসন্তরোগ নিবারণার্থ টিকা লইবার জন্য বলেন, তখন তাহা যে তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য আবশ্যক একথা বুঝা উচিত। কোন সংক্রামক ব্যাধি গৃহে প্রবেশ করিলে কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হয়, এবং কর্তৃপক্ষরা উহার বিস্তার বন্ধের জন্য যাহা করিতে বলেন তাহার পালনে নিজেদেরই

উপকার হয়। বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে আইন ও নিয়মাদির মূল উদ্দেশ্য সকলের স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করা।

স্বাস্থ্যকর বাসস্থান।—বাসস্থানের জন্য স্থান নির্ণয়ে কি কি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক এবং বাসগৃহটি কিরূপে স্বাস্থ্যের উপযোগী করা যায়, তাহা এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। মনোযোগের সহিত সেগুলি পাঠ করিয়া যথাসাধ্য পালন করিলে সমূহ উপকার হইবে।

শহরে বাটী নির্মাণের পূর্বে উহার নক্সা কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। পল্লীগ্রামে তাহার বিধান না থাকিলেও আমরা যে সকল দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি সেগুলি পালন করা উচিত। (প্রথম ভাগ, ২৯ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। সূর্যালোক প্রবেশের ও বায়ু-সঞ্চরণের জন্য উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা না রাখিয়া বা পায়খানার ময়লা ও নর্দমার জল নিকাশের বন্দোবস্ত না রাখিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিলে গৃহ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। প্রতিবাসীরা পরস্পরের সুখ-সুবিধা না দেখিয়া যাহা ইচ্ছা করিলে সেথায় বাস করা কাহারও সুবিধা হয় না। সেইজন্যই সকলের সমবেত চেষ্টা ও ব্যবস্থার নিতান্ত আবশ্যক।

পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যাভাবের কারণ।—বাংলা দেশে পল্লী-গ্রামগুলি প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর এবং ম্যালেরিয়ায় পরিপূর্ণ। তাহার বিশেষ কারণগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

১। **বন।**—চতুর্দিকে বন জঙ্গল থাকিলে গ্রামের ভিতর সুচারুরূপে বায়ু-সঞ্চরণ হইতে এবং সর্বত্র রৌদ্র প্রবেশ করিতে

পারে না। পায়খানার পরিবর্তে লোকে ঝোপের ভিতর গিয়া মলমূত্র ত্যাগ করে; তাহাতে বায়ু দুর্গন্ধ এবং দূষিত হয়। ইহার উপর বন জঙ্গল পচিতে থাকিলে আরও ভয়ংকর হইয়া উঠে। সকলে সমবেতভাবে গ্রামের ভিতরের এরূপ বন জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। গ্রামে ছোট ছোট গাছপালা বেশি জন্মাইলে মশকের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। ঐ সব কাটিয়া ফেলিলে প্রবল বাতাসে বিতাড়িত হইয়া মশক আশ্রয়স্থানের অভাবে গ্রামের ভিতর আর তিষ্ঠিতে পারে না।

২। ময়লা পুষ্করিণী ও সঞ্চিত জল।—অনেকে পুষ্করিণীর ধারে পায়খানা নির্মাণ করে কিংবা ইহার নিকটে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করে; তদ্ভিন্ন নর্দমার জল, আস্তাবল বা গোয়ালের ময়লা জল আসিয়া তাহাতে পড়ে। রজকেরা পুকুরের জলে কাপড় কাচে এবং নানা লোকে সেথায় স্নান করে; এমনকি ক্ষতপীড়িত ব্যক্তিও ঐ জলে নামিয়া স্নান করে। সচরাচর এইরূপেই পুষ্করিণীর জল দূষিত হইয়া পড়ে।

সকল গ্রামেই কতকগুলি অব্যবহার্য ও জঘন্য ছোট ছোট পুকুর বা ডোবা দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি হইতে গ্রামের স্বাস্থ্যের হানি ও মশকের প্রকোপ বর্ধিত হয় মাত্র। এরূপ খানা ডোবা বুজাইয়া ফেলা নিতান্ত আবশ্যক।

পল্লীগ্রামে প্রায়ই বৃষ্টির জল বাহির হইতে না পারিয়া মাটির উপর গর্তে সঞ্চিত হইয়া থাকে। কখনও বা লোকে ঘরবাড়ী নির্মাণ বা মেরামত করিবার জন্য মাটি তুলিতে গিয়া গর্ত কাটে। অনেকে মাটি কাটিয়া গ্রামের ভিতরেই ইটের পাজা প্রস্তুত

করে। এইরূপ নানাকারণে ভূপৃষ্ঠে গর্ত হয় এবং সেথায় জল জমে। যতদূর সম্ভব গর্তগুলি বুজাইয়া ফেলিবে, এবং এমন ভাবে নর্দমার বন্দোবস্ত করিবে যেন জল পড়িলেই বাহির হইয়া যাইতে পারে।

৩। আবাদী জমি।—গ্রামের অতি নিকটে আবাদী জমি থাকিলে গ্রাম অস্বাস্থ্যকর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। নূতন গ্রাম পত্তন কিংবা পুরাতন গ্রামে নূতন বাড়ী নির্মাণ করিতে হইলে ধান্যক্ষেত্র হইতে সমুচিত ব্যবধান রাখিবে। কারণ সেখানে মাঠে জল জমিয়া থাকায় মশকের প্রাদুর্ভাব হয়। বর্ষাকালে এরূপ আবাদী জমিতে জল জমা বন্ধ করা যায় না। অতএব তাহা হইতে দূরে যাইয়া বাস করিবে। ধান্যক্ষেত্রের স্থান গ্রাম হইতে সিকি মাইল অন্তরে নির্দিষ্ট করা উচিত।

৪। দূষিত পানীয় জল।—রোগের জীবাণু দ্বারা দূষিত পানীয় জলের ব্যবহার পল্লীগ্রামের লোকের অনেক ব্যাধির কারণ। মারাত্মক বহুরোগের জীবাণু পানীয় জলের সহিত আমাদের দেহে প্রবেশ করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে সকল লোক দূষিত জল পান করে, তাহাদের ব্যাধি প্রতিরোধ করিবার শক্তি অত্যন্ত কমিয়া যায়; অধিকন্তু দুর্বল শরীরে যে ম্যালেরিয়া সহজে প্রসারপ্রাপ্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫। **অনুপযোগী পয়ঃপ্রণালী**।—পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত না থাকায় প্রায় সকল পল্লীগ্রামেই জল সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং সেজন্য ম্যালেরিয়ারও প্রকোপ হয় ও গ্রাম অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। গ্রামকে পুনরায় স্বাস্থ্যকর করিতে হইলে উত্তমরূপ পয়ঃ-প্রণালীর বন্দোবস্তের প্রয়োজন।

কখন কখন নদী মজিয়া যাওয়ায় এবং জল নিকাশ বন্ধ হওয়ায় গ্রামের ভিতর পচা জল সঞ্চিত থাকে। বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের ইহা একটি অন্যতম কারণ। এইজন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিবে, যাহাতে গ্রামের ভিতর এইরূপ জল জমিয়া না থাকে। যাহাতে পয়ঃপ্রণালী নির্মিত হয়, এবং গ্রামে পচা জল সঞ্চিত না থাকে তজ্জন্য গ্রামের অধিবাসিগণের পরস্পর যথাশক্তি সাহায্য করা উচিত।

গ্রামের আবাসগৃহ।—এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশগুলি পালন করা কর্তব্য :—

১। মাটির ঘরে দেওয়ালের গায়ে এবং মেজের উপর গোবর লেপ দেওয়া অনেকস্থলে প্রচলিত দেখা যায়। ইহা আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে; গোবরে নানাবিধ জীবাণু ও স্বাস্থ্যের হানিকর পদার্থ থাকিতে পারে।

২। মধ্যে মধ্যে মাটির মেজের উপরিভাগ অল্প চাঁচিয়া ফেলিবে, এবং তাহার স্থানে নূতন মাটি দিয়া ভালরূপে পিটিয়া দিবে। ইহা খরা শুক্‌নার দিনে করিলেই ভাল হয়।

৩। ঘরের ভিতর দেওয়াল লেপিবে না, যেমন তেমনি রাখিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে চুন কলি ফিরাইবে।

৪। প্রত্যেক ঘরে সামনা-সামনি করিয়া অন্তত দুইটি জানালা বসাইবে। জানালাগুলি আয়তনে যত বড় হয় ততই ভাল; এক একটির আয়তন অন্তত চারি বর্গফুট হওয়া চাই। জানালা উন্মুক্ত বাতাসের দিকে খোলা হইবে।

৫। রন্ধন গৃহের ধূম যাহাতে শীঘ্র বহির্গত হইয়া যাইতে

পারে তাহার পথ রাখিবে ; সম্ভব হইলে সেজন্য নল বসাইবে ।

৬। ময়লা জল এবং পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট দ্রব্য বাড়ীর সংলগ্ন স্থানে ফেলা উচিত নহে ; উহা দূরে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলিয়া দিবে।

৭। বাটীর চতুর্দিকে ও উঠানে মাটি সমতল করিয়া পিটিয়া দিবে, এবং ইহার ধারে ধারে খাত করিয়া নিকটবর্তী পয়ঃপ্রণালীর সহিত যোগ করিয়া দিবে। ছাদ হইতে বৃষ্টির জল যাহাতে খাত দিয়া শীঘ্র বাহির হইয়া যায় তাহার বন্দোবস্ত রাখিবে।

৮। যতক্ষণ সম্ভব ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া রাখিবে। অন্তত সকাল সন্ধ্যা সেগুলি কিছুক্ষণ খুলিয়া রাখিবে।

৯। মধ্যে মধ্যে বাটীর বাহিরে কলি ফিরাইয়া তাহা পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করিবে।

১০। বাড়ীর বাহিরে পায়খানা নির্মাণ করিবে। ইহার মেজেতে জল বসিতে না পারে সেজন্য উহা সিমেণ্ট দিয়া প্রস্তুত করিবে। মেথর খাটিবার পথ পশ্চাতে বাহিরের দিকে রাখিবে, এবং দেখিবে যাহাতে পায়খানা নিয়মিত পরিষ্কৃত হয়। পায়খানায় যাহাতে বায়ু এবং আলোক প্রবেশ করিতে পারে, সেজন্য বন্দোবস্ত রাখিবে। পল্লীগ্রামে যেখানে পায়খানা নাই, সেখানে বাটী হইতে যতদূর সম্ভব দূরে গিয়া মলত্যাগ করিবে এবং বিষ্ঠার উপর মাটি চাপা দিবে। জলাশয়ের ধারে কখনও মলত্যাগ করিবে না।

১১। যদিও বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে গাছ পালা থাকিলে বাড়ীটি সুন্দর দেখায়, তথাপি এমন বৃক্ষাদি নিকটে থাকিতে দিবে না,

যাহাতে নির্মল বায়ু বা আলোকের পথে কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

১২। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি রাখিতে হইলে বাটীর বাহিরে তাহাদের স্থান নির্ধারণ করিবে।

১৩। এক গৃহে অতিরিক্ত সংখ্যক লোক বাস করিবে না। এক বাড়ীতে অনেকগুলি পরিবারের একত্র বাস প্রায়ই স্বাস্থ্যের বিঘ্নজনক হয়, অতএব তাহা করিবে না।

জঞ্জাল ও ময়লা দূরীকরণ

জঞ্জাল ও ময়লা।—প্রতিদিনই আমাদের বসতবাটীতে নানাবিধ আবর্জনা জমে। যথা,—ঘর, বারাণ্ডা, উঠান প্রভৃতি ঝাঁট দেওয়া খড়, কুটা, ধূলা ইত্যাদি; পরিত্যক্ত লতাপাতা, ফল ও তরিকারির খোসা, মাছের আঁশ কাঁটা, মাংসের চামড়া হাড় ইত্যাদি ভুক্তাবশিষ্ট এঁটোকাঁটা, ভাত, তরিতরকারি প্রভৃতি শুষ্ক আবর্জনা; এবং ভাতের ফেন, বাসনমাজা ও হাতমুখ ধোয়া জল, কাপড় কাচা জল, স্নানের জল ও মলমূত্রাদি তরল আবর্জনা। সুবিধার্থে প্রথমগুলিকে জঞ্জাল এবং শেষগুলিকে ময়লা বলিয়া অভিহিত করা হইল।

আবর্জনার ধ্বংস।—জঞ্জাল ও ময়লা ধ্বংস করিতে না পারিলে আমাদের নিরাপদে বাস করা কঠিন। এজন্য যেখানে বহুলোক একত্র বাস করে সেখানে সমবেতভাবে বহু ব্যয়সাধ্য নানা উপায় অবলম্বিত হইতে থাকে। শহরের প্রত্যেক বাটী হইতে জঞ্জাল জড় করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া বহুদূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়,

কোথায়ও বা তাহা পুড়াইয়া ফেলা হয়। শহরের তরল ময়লা ও নোংরা জল ড্রেনের ভিতর দিয়া বহিয়া বহুদূরে গিয়া পড়ে। যেখানে ড্রেন নাই সেখানে বিষ্ঠাদি ময়লা আলাদা জমা করিয়া দূরে মাটিতে পুতিয়া ফেলা হয়। তরল ময়লা যদি নর্দমায় পড়িয়া, পর্যাপ্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশিয়া, বহুদূরে চলিয়া যায় তখন আর কিছু না করিলেও চলে, কিন্তু ঐরূপে ময়লা দূর করিবার সম্ভাবনা না থাকিলে তাহা মাটির মধ্যে পুতিয়া ফেলিতে হইবে।

গৃহস্থের কর্তব্য।—কোন স্থানে জঙ্গাল বা ময়লা জমিয়া পচিলে তাহার নিকটবর্তী বাটীতে বাস করা নিরাপদ নহে। কিন্তু অল্প লোকেই তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারে এবং তাহারা ঐ জঙ্গাল ও ময়লা ধ্বংস করিতে কোন চেষ্টা করে না। ঝাঁট-দেওয়া জঙ্গাল অনেকে ঘরের কোণে জমা করিয়া রাখে এবং উঠানের আবর্জনা উঠানেই পড়িয়া পচিতে থাকে। রান্নাঘর-ধোয়া জল ও খাদ্য-দ্রব্যাদির ভুক্তাবশেষ বা পরিত্যক্ত অংশ যেখানে সেখানে ফেলিয়া দেওয়া হয়; এমন কি মল, মূত্র, চোনা, গোবর ইত্যাদি ময়লাও যেখানে সেখানে ফেলা হয়। তাহার ফলে বাটীতে সর্বদা দুর্গন্ধ হয়, মাছির উৎপাতে বাস করা দায় হইয়া পড়ে এবং তথায় নানাবিধ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়।

যাহারা শহরবাসী তাহাদের কর্তব্য প্রত্যেক বাটীতে যে জঙ্গাল জমে তাহা নির্দিষ্ট স্থানে জড় করা ও মিউনিসিপাল্টির ময়লা-ফেলা গাড়ী আসিবার পূর্বে নিকটবর্তী ডস্টবিন্ (dustbin) বা ময়লা-ফেলা টবে ফেলিয়া দেওয়া। পরে ধাঙ্গড়েরা সেখান হইতে উহা জঙ্গালের গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিবে।

নিয়ম থাকিলেও শহরের মধ্যে অনেক সময় জঞ্জাল পড়িয়া থাকায় অপরিষ্কার হইয়া থাকে। কলিকাতার ন্যায় উন্নত শহরেও স্থানে স্থানে সদাসর্বদা ময়লা দেখা যায়। ইহার জন্য শহরবাসীরা অনেক স্থলে দায়ী। দেখা যায় অনেকে যখন তখন রাস্তায় জঞ্জাল ফেলে। জঞ্জালের গাড়ী ময়লা উঠাইয়া লইয়া যাওয়ার পরেই আবার সেখানে ময়লা ফেলিলে তাহা পড়িয়া থাকিবে ইহা বিচিত্র কি? সারাদিন ধরিয়া প্রত্যেক স্থানে জঞ্জালের গাড়ী হাজির থাকিতে পারে না। অতএব মিউনিসিপালিটির ব্যবস্থায় যখন গাড়ী আসিবে সেই সময় সমস্ত জঞ্জাল রাস্তায় ফেলা দরকার, এবং আবার যতক্ষণ গাড়ী না আসিবে, ততক্ষণের জন্য রাস্তায় উহা ফেলা উচিত নহে।

পল্লীগ্রামে বাটীর দূরে নির্দিষ্ট স্থানে জঞ্জাল স্তূপাকার করিয়া পুড়াইয়া দিবে। আবশ্যক হইলে ঐ স্তূপে কিছু কেরোসিন তৈল ঢালিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিবে। পোড়ানর সুবিধা না হইলে গর্ত করিয়া পুতিয়া ফেলিলে শীঘ্রই উহা পচিয়া মাটিতে মিশিয়া যায়।

মেথর খাটা পায়খানা।—যেখানে ড্রেন নাই এবং বড় বড় পল্লীগ্রামে মেথরেরা পায়খানা হইতে বিষ্ঠাদি ময়লা, আলকাতরা লাগান কাঠের বালতিতে বহন করিয়া, স্থানান্তরিত করে এবং স্থানে স্থানে লোহার গাড়ীতে ভরিয়া বিষ্ঠাদি দূরে বাহিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রথার অনেক দোষ আছে; কখন কখন দুর্গন্ধে স্থানগুলি নরক সদৃশ হইয়া পড়ে। যাহাহউক, বিষ্ঠার গামলা ও মেথরের বালতিতে মাঝে মাঝে আলকাতরা মাখাইয়া দিতে হইবে

এবং যতদূর সম্ভব সেগুলি সাফ রাখিতে হইবে। বিষ্ঠার সহিত মূত্র ও ময়লা জল না মিশিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে।

সকল পল্লীগ্রামেই মেথর নিযুক্ত করিয়া পায়খানার ময়লা দূরে মাটিতে পুতিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। পায়খানা নির্মাণের নানাবিধ প্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছোট ছোট শহর এবং পল্লীগ্রামের পক্ষে উপযোগী পায়খানার কয়েকটি নমুনা দৃষ্ট হয়। ঐরূপ পায়খানা লোহার চাদরের নির্মিত এবং উহার মূল্যও বেশী নহে; তাহাতে এরূপ ব্যবস্থা আছে যে মল একদিকে পড়ে এবং মূত্র ও জল অন্যদিকে জমে। উহার প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়।

ময়লাপোতা।—খাত কাটিয়া মাটির ভিতর ময়লা পুতিবার ব্যবস্থা সাধারণত প্রচলিত আছে। খাতগুলি প্রশস্ত অথচ অগভীর করিয়া কাটিতে হয়। এক ফুট গভীর ও তিন ফুট চওড়া করিয়া খাত খনন করাইবে এবং প্রতি খাতে তিন ইঞ্চির অধিক ময়লা ঢালিবে না। ময়লার উপর গর্ত-খোঁড়া মাটি চাপা দিবে। মাটির সহিত ময়লা মিশিয়া গেলে শীঘ্রই দুর্গন্ধ দূর হয়।

ময়লা পোতা জমিতে চাষ।—ময়লা পোতা জমি স্বাস্থ্যের পক্ষে যে অল্প বিশেষ বিপজ্জনক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জমিতে চাষ করিলে বিপদ বরং অনেক কমিয়া যায়। কেহ কেহ এই স্থানের ফসল খাইতে আপত্তি করে, কিন্তু বিস্তর ময়লা পোতা জমিতে চাষ হইতেছে ও সেখানে বাঁধা কপি, ফুল কপি প্রভৃতি এবং সরিষা ভুট্টাদি নানাবিধ শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তুর মলমূত্র যে চাষের পক্ষে উপকারী, তাহা সকলেই জানে। কৃষকেরা জানে যে, ময়লা

পোতা জমিতে বেশ ফসল হয়, এইজন্য তাহারা এই জমি অধিক মূল্যে বিলি করিয়া লয়। যাহাহউক, এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এই প্রথাও বিপদশূন্য নহে ; মলমূত্রের ভিতর উৎকট ব্যাধির বীজ নিহিত থাকিতে পারে, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

শহরের ড্রেন।—শহরে তরল ময়লা প্রভূত পরিমাণ জলের সহিত মিলিয়া মাটির নীচের ড্রেনের ভিতর দিয়া চলিয়া যায় এবং ক্রমশ বহু দূরে যাইয়া পড়ে। কলিকাতা শহরে উহা ধাপার মাঠের দিকে যাইয়া নদীতে পড়ে। ড্রেনের ব্যবস্থা সন্তোষজনক করিতে হইলে প্রচুর জলের আবশ্যক, নতুবা ড্রেনগুলিতে ময়লা জমিয়া যায় এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ ও দূষিত বাষ্প নির্গত হয়। তদ্ব্যতীত বাটীর ড্রেন আধুনিক নিয়মাদি সম্মত করিতে হইলে যেমন অর্থব্যয় হয় তেমনি সর্বদা সেগুলির কার্যকারিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। সেগুলি নিয়মিত ভাবে গঠিত ও রক্ষিত না হইলে কখন কখন বিপদ আসিয়া পড়ে। ড্রেন পরিষ্কার রাখিতেও প্রচুর জলের আবশ্যক।

সেপটিক ট্যাঙ্ক।—আজকাল স্থানে স্থানে তরল ময়লার দোষ নিবারণের জন্য "সেপটিক ট্যাঙ্ক" নির্মাণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে তরল ময়লা কতকগুলি চৌবাচ্চার ভিতর ফেলা হয়। তথা হইতে উহা ক্রমে ঝামা খোয়া, কয়লা, ছাই ইত্যাদিতে পূর্ণ স্বতন্ত্র চৌবাচ্চার ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। ঐগুলির ভিতরে হাওয়া যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দেখা গিয়াছে যে, এই প্রথায় কতকগুলি জীবাণুর সাহায্যে ঐ ময়লার নানাপ্রকার দোষ নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রথার উন্নতির

জন্য অধুনা অনেক প্রকার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার খরচা বেশী নহে এবং পল্লীগ্রামে সহজে ইহার প্রবর্তন করা যাইতে পারে। বাংলার সরকারী রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, গঙ্গার ধারের অনেক বড় বড় মিল ও কলকারখানায় সেপটিক ট্যাঙ্ক প্রচলিত হইয়াছে এবং ফলও আশাপ্রদ হইয়াছে। কলকারখানার সাহায্যে উহা আরও কার্যকরী করার চেষ্টা হইতেছে।

শবদেহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা।—শবদাহের প্রথাই যে স্বাস্থ্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। শবদেহ মাটিতে প্রোথিত করার প্রথা হইতে নানাপ্রকার বিপদ উৎপন্ন হইতে পারে। মাটির ভিতর শবদেহের পচন হইতে উৎপন্ন দুর্গন্ধ ও দূষিত পদার্থ ক্রমে গিয়া কূপ এবং জলাশয়াদিতে প্রবেশ করে, এবং ব্যাধির উৎপত্তির কারণ হইতে পারে। গোরস্থানের বৃক্ষাদি তাহাদের পুষ্টির জন্য ঐ পূতিগন্ধ পদার্থাদি কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানের দোষ কতকটা হ্রাস করে। শব দাহ করিবার সময়ও কতকগুলি পূতিগন্ধ পদার্থ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেগুলি এত শীঘ্র বায়ুর সহিত মিলিয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে যে তাহাতে অপকার হয় না। এই জন্য শবদাহ প্রথায় বিপদের আশঙ্কা কম। কিন্তু ইহাতে এই একটি অসুবিধা আছে যে, শব দাহ করিবার পর আবশ্যক হইলে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা যায় না। কেহ খুন করিয়া শব পোড়াইয়া ফেলিলে তাহার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

লোকালয়ের কাছে কিংবা জলাশয় বা কূপের ধারে গোরস্থান নির্দিষ্ট করিবে না। যেখানকার মৃত্তিকা সচ্ছিদ্র ও শুষ্ক তাদৃশ

স্থানই গোরস্থানরূপে ব্যবহারের পক্ষে প্রশস্ত। গোর যেন ৫।৬ ফুটের কম গভীর না হয়। পাকা গাঁথনির গোর ভাল নয়, কারণ ইহাতে শব পচিতে বিলম্ব হয়। কখন কখন অনাবৃত বা অল্প প্রোথিত অবস্থায় শবদেহ ফেলা হয়; ইহাতে কুকুর, শৃগাল, শকুনি প্রভৃতি উহা ধরিয়া টানাটানি করে। সাধারণের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত এবং যাহাতে ইহা একেবারে নিবারিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা কর্তব্য।

জন্তুদের মৃতদেহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা।—প্লেগের বিস্তৃতির একটা কারণ ইন্দুর, এবং ইহারা সহজেই প্লেগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেইজন্য ইন্দুরের মৃতদেহ হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিয়া কেরোসিন তৈল ঢালিয়া পোড়াইয়া ফেলিলে ভাল হয়। প্লেগের সময় এইরূপ সতর্কতা বিশেষ আবশ্যক। জন্তুর মৃতদেহ রাস্তার মধ্যে কিংবা বাটীর নিকট যেন পড়িয়া না থাকে। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি আছে সেখানে ডোমেরা বিড়াল, কুকুর প্রভৃতির মৃতদেহ স্থানান্তরিত করে। এই সকল মৃতদেহ পোড়াইবার কোন বন্দোবস্ত না থাকিলে লোকালয় ও জলাশয় হইতে দূরে মাটিতে গভীর গর্ত করিয়া পুতিয়া ফেলিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সাধারণ ব্যাধি, তাহার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

বাংলাদেশে কতকগুলি ব্যাধি প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। প্রতি বৎসর বহু লোক তাহা হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিংবা প্রাণ না হারাইলেও অনেকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় অথবা নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ঐ সকল রোগের বিবরণ, নিবারণের উপায় ও চিকিৎসা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১। **ম্যালেরিয়া**।—পূর্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে দূষিত বায়ু, আর্দ্র-ভূমি-বিনির্গত বাষ্প কিংবা দূষিত জল হইতে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্লাসমোডিয়ম নামক এক প্রকার কীটাণুই ম্যালেরিয়ার কারণ। ইহা অতি ক্ষুদ্র এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না। মশকেরা যখন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করে তখন রক্তের সহিত এই কীটাণুও তাহাদের দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু সকল জাতীয় মশকের দেহে ইহা দৃষ্ট হয় না। অ্যানোফিলিস (anopheles) জাতীয় মশকের দেহে এই কীটাণুকে প্রবিষ্ট ও বর্ধিত হইতে দেখা যায়। মশকদেহে কয়েক প্রকার পরিবর্তনের পর ঐ কীটাণু মশকদংশনের সহিত মনুষ্যশোণিতে পুনঃপ্রবিষ্ট হয় এবং তথায় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের তিনটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় শীত ও কম্পনের সহিত শিরোবেদনা ও সময়ে সময়ে

বমন ও তরল দাস্ত হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় কম্পন নিবৃত্তি হয় ও গাত্র অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বেদনা, শিরঃপীড়া ও জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ সকল স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কিয়ৎকাল জ্বর ভোগ হইবার পর তৃতীয় অবস্থায় গাত্রে ঘর্ম নিঃসৃত হইয়া জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরের অনেক স্থলে "পালা" দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ কখন বা ২৪ ঘণ্টা অন্তর, কখন বা ৪৮ ঘণ্টা অন্তর এবং কখনও বা ৭২ ঘণ্টা অন্তর এই জ্বর প্রকাশ পায়। এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের পালাজ্বর হইবার কারণ এই যে, ম্যালেরিয়ার কীটাণু-গুলি বিভিন্ন প্রকারের, এবং তাহাদের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির কালের তারতম্যের উপরই এই পালার ক্রম নির্ভর করে। অচিকিৎসিত অবস্থায় থাকিলে, অল্প দিনের মধ্যে প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিছুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিলে নানা উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, রক্তাল্পতা দেখা দেয় এবং শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে।

যখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে মশকের সহিত ম্যালেরিয়া রোগের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তখন যে সকল কারণে মশকের বংশবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা সেইগুলিকে গ্রামে ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাবের কারণ বলা যাইতে পারে। আমরা এই স্বাস্থ্যপাঠের দ্বিতীয় ভাগের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে ম্যালেরিয়ার অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

প্রতিরোধ।—ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে মশক নিবারণের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। ভূপৃষ্ঠে জল জমিয়া না থাকে সেজন্য খানা, ডোবা, গর্ত ইত্যাদি মাটি দিয়া ভরাট করিয়া মশকের ডিম

পাড়িবার স্থান বন্ধ করিবে। পুরাতন টিনের বা মাটির কিংবা অন্য কোনরূপ পাত্র বাটীর নিকট পড়িয়া থাকিলে তাহাতে জল জমে ও তখন মশকেরা তথায় ডিম পাড়ে; অতএব ঐরূপ কোন পাত্র যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিবে না। বাটীর ভিতরে বা সন্নিকটে কিংবা স্নানের ঘরে অনেকক্ষণ জল জমা করিয়া রাখা উচিত নয়। মাঝে মাঝে পুকুরের জলের উপর অল্প পরিমাণ কেরোসিন বা ঐ জাতীয় তৈল পাতলা করিয়া ঢালিয়া দিবে; তাহাতে মশকের ডিম নষ্ট হইয়া যায়। পুষ্করিণীর ধারে ছোট ছোট আগাছার ভিতর মশকেরা ডিম পাড়ে, এইজন্য সেগুলি ও বাটীর নিকটস্থ জঙ্গলাদি কাটিয়া ফেলিবে।

যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে সেস্থানে না যাওয়াই ভাল; অন্তত তথায় রাত্রিবাস করিবে না। ম্যালেরিয়া-পীড়িত স্থানে সকল লোকেরই মশারি খাটাইয়া শয়ন করা উচিত; তাহাতে মশা কামড়াইতে পারে না। অ্যানোফেলিস জাতীয় মশক, যাহাদের দংশনে ম্যালেরিয়া হয়, উহারা রাত্রিকালেই বেশি উপদ্রব করে, এই জন্য রাত্রে অধিকতর সাবধানতা আবশ্যক। বাংলাদেশে সন্ধ্যাকালে গৃহে গৃহে ধুনাগন্ধকাদির ধূম দিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহা বেশ উপকারী, কারণ ধুনা গন্ধকের গন্ধে মশকেরা পলায়ন করে। খাট তক্তাপোশ প্রভৃতির নীচে, ছবি টেবিল আলমারির পিছনে ও ঘরের চালার উপর অন্ধকার স্থানেই মশকেরা আশ্রয় গ্রহণ করে; অতএব ঐ সকল স্থান সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে। ঘরের ভিতর মধ্যে মধ্যে চুনকাম করিলে মশকের উৎপাত কম হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়ার বিষ দেহে প্রবেশ করিলে, তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্বেই, কুইনীন সেবন করা ভাল। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কালে প্রত্যহ অল্প পরিমাণে (৪।৫ গ্রেন) নিয়মিতরূপে কুইনীন সেবন করিলে উহার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

ম্যালেরিয়া রোগীকে যতদূর সম্ভব সুস্থ লোক হইতে পৃথক রাখা উচিত। কিন্তু এই নিয়ম পালন করা সহজ নয়। সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকে এক শয্যায় শয়ন করে; ইহাতে ম্যালেরিয়ার প্রসারের সহায়তা হয়। রোগীর জন্য স্বতন্ত্র গৃহের বন্দোবস্ত করিতে না পারিলেও অন্তত একটি স্বতন্ত্র বিছানা ও মশারির বন্দোবস্ত করা উচিত।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়গুলি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত হয় সেজন্য সকলেরই সমবেত চেষ্টা ও উদ্যম করা উচিত। ইউনিয়ন বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির কর্তৃপক্ষীয়েরা এবিষয়ে যেরূপ উপায় অবলম্বন করেন বা সর্বসাধারণকে করিতে পরামর্শ দেন, সকলেরই সেইরূপ করা বা তাহাতে সহায়তা করা কর্তব্য। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই, তাঁহার অজ্ঞ ও অশিক্ষিত প্রতিবেশিগণকে ঐ নিয়মগুলি পালনে উৎসাহিত করিবার আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত।

চিকিৎসা।—পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তের কীটাণুগুলি কুইনীন নামক ঔষধে মরিয়া যায়। এইজন্য ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; বাস্তবিক কুইনীনই ইহার অমোঘ ঔষধ। অতএব দেহে ম্যালেরিয়া বিষ প্রবেশ করিলে কুইনীন ব্যবহার করা বিধেয়। পূর্বোক্ত

লক্ষণাদি হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর সহজেই নির্ণয় করা যায়। আবশ্যক হইলে ডাক্তারেরা অণুবীক্ষণ সাহায্যে রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া ম্যালেরিয়া কীটাণুর অস্তিত্ব নিরূপণ করেন।

কুইনীনের মোড়ক কিংবা ট্যাবলেট বা চাক্‌তি আজকাল প্রায় সকল স্থানেই অতি অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। উহার মাত্রা পূর্ণবয়স্কের পক্ষে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, তিন চারি বারে মোটের উপর ২০ হইতে ৩০ গ্রেন পর্যন্ত। কুইনীন খাইয়া জ্বর বন্ধ হওয়ার পরও, মাত্রা কমাইয়া আরও কয়েকদিন উহা সেবন করা আবশ্যক। দেহ হইতে ম্যালেরিয়া বিষ সম্পূর্ণ তিরোহিত না হওয়া অবধি উপযুক্ত পরিমাণ কুইনীন সেবন বিধেয়। সচরাচর জ্বরের বিরাম অবস্থায় কুইনীন খাওয়ান হয়, কিন্তু উহা জ্বরের সময়ও প্রয়োগ করা যায়। কুইনীনের তিক্ততা বশত পিল বা চাক্‌তি আকারে উহা খাওয়ার প্রথা চলিত হইয়াছে, কিন্তু মিকশ্চার করিয়া খাইলে অধিক ফল পাওয়া যায়। যত প্রকার ম্যালেরিয়ার পেটেণ্ট ঔষধ আছে তাহার প্রায় সকল গুলিতেই কুইনীন আছে: অতএব না জানিয়া ঐসব খাওয়া অপেক্ষা চিকিৎসকের উপদেশ মত কুইনীন সেবন করাই শ্রেয়।

২। **যক্ষ্মারোগ**।—যক্ষ্মা বা টিউবার্‌কিউলোসিস (tuberculosis) রোগ একটি সংক্রামক ব্যাধি। ইহা আশুমৃত্যুজনক না হইলেও ধীরে ধীরে রোগীর শরীর ক্ষয় করিয়া ফেলে; এই জন্য সাধারণত ইহাকে ক্ষয়রোগ বলে। ইহা টিউবার্কল (tubercle) নামক সূক্ষ্ম জীবাণু হইতেই উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ স্থলে ফুসফুসই এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্ষতদূষিত হয়; কিন্তু ফুসফুস ব্যতীত অন্ত,

অস্থিসন্ধি, গ্রন্থি প্রভৃতি দেহের অন্যান্য স্থানও ঐ জীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। ফুসফুস আক্রান্ত হইলে যক্ষ্মা রোগকে থাইসিস (pthisis) বা যক্ষ্মাকাশ বলা হয়। পৃথিবীতে বহুলোক এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। কলিকাতার ন্যায় বহুজনাকীর্ণ শহরে এই রোগ ক্রমশই প্রসার প্রাপ্ত হইতেছে। পল্লীগ্রামে বা খোলা জায়গায় যাহারা বাস করে তাহাদের ভিতর এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম দেখা যায়।

কাসি, শ্বাসকষ্ট, ঈষৎ পীতবর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসরণ অথবা তাহার সহিত রক্ত উঠা, জ্বর, শরীরের শীর্ণতা, মুখমণ্ডলে রক্তিম আভা, এবং তৎসঙ্গে দেহের ও বলের হ্রাস প্রভৃতি ক্ষয় রোগের লক্ষণ।

যক্ষ্মারোগের কারণ।—দারিদ্র্য, সংকীর্ণ গৃহে বাস, একত্র বেশি লোকের বাস, নির্মল বায়ু ও সূর্যালোকের অভাব, অপ্রচুর বা অপুষ্টিকর খাদ্য ভোজন, গুরুতর পরিশ্রমজনিত দৌর্বল্য, আর্দ্র-ভূমিতে বাস, অতিরিক্ত মদ্যপান প্রভৃতি ক্ষয়রোগের গৌণ কারণ। ঐ সকল কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে সহজেই ক্ষয়রোগের জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া প্রসার পায় ও রোগ উৎপন্ন করে।

প্রতিরোধ।—যক্ষ্মারোগীর পরিত্যক্ত শ্লেষ্মায় অসংখ্য টিউবার্কল জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী হাঁচিলে বা কাসিলে, কফ্ বা শ্লেষ্মার সহিত কিংবা নির্গত প্রশ্বাসের সহিত এই জীবাণুগুলি বহির্গত হইয়া তত্রত্য বায়ুকে দূষিত করে ও গৃহের আসবাব ইত্যাদিতে ও ধূলিকণাতে সঞ্চিত হয়। মক্ষিকা দ্বারাও উহা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। রোগীর পরিত্যক্ত শ্লেষ্মার কণাগুলি, এমন কি দেড় ঘণ্টা কাল বায়ুর মধ্যে ভাসিতে

দেখা যায়। উহা শুষ্ক হইলে বায়ুর সহিত প্রবাহিত হইয়া অনেক দূর পর্যন্ত রোগ বিস্তার করিতে পারে। রোগীর ব্যবহৃত শয্যা, পরিধেয় বস্ত্র, রুমাল প্রভৃতির সহিতও যক্ষ্মার জীবাণু অন্যত্র পরিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। যদি ঐ কফ্ শ্লেষ্মা হইতে জীবাণুর বিস্তার বন্ধ করা যায় তাহা হইলে ব্যাধির প্রতিরোধ সম্ভব হইতে পারে।

যক্ষ্মারোগী ঘরের মেঝেয়, দেওয়ালের গায়ে বা যেখানে সেখানে কফ্, শ্লেষ্মা ও থুতু না ফেলিয়া একটি নির্দিষ্ট পিকদানে তাহা ফেলিবে। ঐ পিকদান কাচের বা চীনামাটির অথবা যাহা সহজে পরিষ্কৃত হইতে পারে এরূপ পাত্র হইবে এবং তাহাতে সর্বদা কোন বীজঘ্ন ঔষধের জল ঢালা থাকিবে। ঐ পাত্রে মাছি না বসে সেজন্য ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়। মাঝে মাঝে ঐ পিকদান হইতে শ্লেষ্মাদি নষ্ট করিয়া ফেলিবে; পোড়াইয়া দিলেই ভাল হয়। পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড বা কাগজের টুকরায় শ্লেষ্মা ফেলিয়া পোড়াইয়া ফেলা মন্দ নহে। কদাপি কোন জলাশয়ে ঐ পিকদানের শ্লেষ্মা ফেলা বা তাহা ধোয়া উচিত নহে। রোগীর ব্যবহৃত শয্যা পরিচ্ছদাদি অন্য কেহ ব্যবহার করিবে না। সেগুলি বীজঘ্ন দ্রব্যের সাহায্যে রীতিমত শোধিত ও পরিষ্কার করিয়া লইবে।

রোগীর ঠোঁটে যক্ষ্মার জীবাণু থাকার সম্ভাবনা জানিয়া তাহার কাহাকেও চুম্বন করা এবং অন্যের হুকায় তামাক খাওয়া উচিত নহে। রোগীর উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি বা তাহার পাত্রে কেহ ভোজন করিবে না। গাভীর যক্ষ্মারোগ থাকিলে তাহার দুগ্ধ দূষিত হয়;

এজন্য দুগ্ধ সিদ্ধ না করিয়া পান করিবে না। রোগাক্রান্ত মাতা শিশুকে স্তন্যপান করাইবে না বা তাহাকে পালন করিবে না।

চিকিৎসা।—প্রথমাবস্থা হইতেই রোগীর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিলে রোগ সারিয়া যাইতে পারে। প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর সুপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া রোগীর দেহে বলাধান করাই ইহার প্রধান চিকিৎসা। স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া, উপযুক্ত ভাবে সূর্যালোক উপভোগ করা ও শারীরিক বিশ্রাম লওয়া এবং সদাসর্বদা বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু সেবন করা এই রোগে নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্য ধূলিশূন্য পার্বত্য প্রদেশে বা সমুদ্রতীরে বাস করা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। গৃহে রুদ্ধ না রাখিয়া রোগীকে খোলা বারান্দায় রাখিবার বন্দোবস্ত করা ভাল। তথায় আবশ্যকমত গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে দিবে এবং ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য পর্দার ব্যবহার করিবে। বাস্তবিক যেখানে সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ুর অভাব তাদৃশ স্থানে যক্ষ্মারোগীর ক্ষণমাত্র থাকা উচিত নহে। রোগীর শুশ্রূষাকারীর জন্য স্বতন্ত্র শয্যার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য।

যক্ষ্মারোগীর ঔষধের দরকার হয় বটে, কিন্তু সেজন্য উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হইবে। স্মরণ রাখিবে যে ইহার কোন "পেটেণ্ট" বা "অব্যর্থ মহৌষধ" নাই। যদি কেহ বাহির করিতে পারেন তাঁহাকে জীবিকার জন্য ব্যবসা করিতে হইবে না। অতএব প্রতারিত না হইয়া আমরা উপরে যে পথ নির্দেশ করিলাম সেই পথেই চলিবে। আধুনিক

চিকিৎসা পদ্ধতিতে যে সব নূতন বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার ফল আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়।

৩। **বসন্তরোগ**।—বসন্ত রোগ সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলায় সাধারণ লোকে ইহাকে "ইচ্ছা বসন্ত" বলে। ইহা একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংক্রামক ব্যাধি। শিশুদিগের পক্ষে ইহা প্রায় সাংঘাতিক হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর এই রোগে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং মাঝে মাঝে ইহা মহামারীরূপে প্রাদুর্ভূত হয়।

বসন্ত রোগের পৃথক পৃথক কয়েকটি অবস্থা আছে। ইহার প্রচ্ছন্ন (incubation) কালের ১০।১২ দিন পর প্রথমে রোগীর শিরঃপীড়া, কম্প, মেরুদণ্ডে ও উরুদেশে বেদনা, বিবমিষা বা বমন ও তীব্র জ্বর হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায়, সাধারণত তিন দিন অবিরাম জ্বর ভোগের পর, ত্বকের স্থানে স্থানে বা সর্বাঙ্গে রক্তিম আভা দেখা দেয়। অল্পকাল পরে প্রথম মুখমণ্ডলে, পরে গ্রীবাদেশে এবং মধ্যদেহে রক্ত বর্ণের দানা পরিদৃষ্ট হয়; অতঃপর ইহা দেহের অন্যান্য স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। মুখ, নাসিকা, চক্ষু এবং গলনালীতেও ইহা উদ্ভূত হওয়ায় রোগী কাসিতে থাকে। পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসূরাকৃতি গুটি দেখিতে পাওয়া যায়; গুটিগুলি বাহির হইবার প্রারম্ভেই রোগীর জ্বর কমিয়া যায়।

ক্রমে গুটিগুলির অভ্যন্তরস্থিত স্বচ্ছ রস, ক্লেদযুক্ত ও অস্বচ্ছ হয় এবং স্ফোটের চতুর্দিকে একটি রক্তবর্ণ মণ্ডল পরিদৃষ্ট হয় ও গুটিগুলির মধ্যস্থান বসিয়া যায়; এই পরিবর্তনগুলির সঙ্গে

সঙ্গে পুনরায় জ্বরের বৃদ্ধি হয়। ইহাই বসন্তরোগের পরিণত অবস্থা।

অবশেষে গুটিগুলি শুকাইয়া আসে ও তাহার উপর মামড়ি পড়ে, এবং উহা উঠিয়া গেলেও একটি চিহ্ন থাকিয়া যায়। এই অবস্থায় জ্বর ছাড়িয়া যায় এবং ক্রমে রোগী সুস্থ হয়।

বসন্ত রোগের সাধ্য ও অসাধ্য প্রভৃতি অনেক প্রকারভেদ আছে। সুসাধ্য বসন্ত সহজেই আরোগ্য হয়। প্রায় ১০।১২ দিনের মধ্যে গুটিগুলি শুকাইতে আরম্ভ করে ও তাহাতে মামড়ি পড়ে, কিন্তু রোগীর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে প্রায় একমাস কাটিয়া যায়। অসাধ্য হইলে, পরিণত অবস্থায় যে জ্বর হয় তাহা প্রবল হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রের পীড়া ও প্রলাপাদি নানারূপ উপসর্গ উৎপন্ন হওয়ায় রোগীর মৃত্যু হয়। কখন বা রোগের প্রথম অবস্থাতেই সাংঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। কোন কোন স্থলে বসন্ত রোগীকে অন্ধ ও বধির হইতে দেখা যায়।

বসন্তের জীবাণু কোন প্রকারে শরীরে প্রবেশ করিলে বসন্ত রোগ জন্মে। রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র, শয্যা প্রভৃতির সংস্পর্শ হইতেও এইরোগ জন্মিতে পারে। বসন্তের পূঁযের দ্বারা টিকা দিলে বসন্ত বাহির হয়। বসন্তরোগ একপ্রকার অতীব সূক্ষ্ম জীবাণু হইতে উদ্ভূত। উহা অতি সহজে বায়ুপ্রবাহে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; এমন কি যেস্থানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তথা হইতে যে দিকে বায়ু বহে সেই দিকেই ইহার অধিক বিস্তার দেখা যায়।

প্রতিরোধ।—বসন্ত রোগের বিষ হইতে দূরে বাস করিতে পারিলে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ঐ বিষ বায়ুর সঙ্গে এত সহজে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের সংস্পর্শে আসে যে নিকটে বসন্তরোগী থাকিলে আমাদের সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া কঠিন। যখন ঐ ব্যাধি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে তখন বিপদের আর সীমা থাকে না; সম্ভবপর হইলে সেই স্থানের সংস্পর্শ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু বসন্তের টিকা লইলে অনেকটা নিরাপদ হওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেজন্য পৃথিবীর সর্বত্র বসন্তের টিকা প্রচলিত হইয়াছে।

বসন্তের টিকা।—গো-দেহজ বসন্ত বা গুটি হইতে "লিম্ফ" বা রস লইয়া মনুষ্য দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়ার নাম বসন্তের টিকা বা ভ্যাকসিনেশান (vaccination)। এই টিকা প্রচলিত হইবার পর অত্যাশ্চর্য উপকার দেখিয়া পৃথিবীর সর্বত্র ঐ টিকা লইবার জন্য আইন হইয়াছে। ভারতবর্ষেও আইন অনুসারে বসন্তের টিকা লইতে সকলেই বাধ্য। কিন্তু অজ্ঞতাপ্রযুক্ত এখনও অনেকে বিজ্ঞানের এই কল্যাণকর ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

টিকা দিলেই যে আর কখনও বসন্ত হইবে না তাহার স্থিরতা না থাকিলেও, একথা বলা যাইতে পারে যে, টিকার স্ফোট ভাল করিয়া উঠিলে কিছুদিনের জন্য আর বসন্ত ধরিতে পারে না। সেজন্য ৫।৬ বৎসর অন্তর পুনরায় টিকা দিবার জন্য ডাক্তারেরা উপদেশ দেন।

টিকা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশগুলি পালন করিবে ঃ—

১। জন্মের ছয় মাসের মধ্যেই প্রত্যেক শিশুর টিকা দিতে হইবে ; নতুবা দন্তোদ্গমের সময় আসিয়া পড়িলে শিশুর অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা, তখন টিকা দেওয়ার অসুবিধা হইতে পারে।

২। প্রত্যেক শিশুর টিকার চারিটি স্ফোটই স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। ৫।৬ বৎসর অন্তর পুনরায় টিকা দেওয়া উচিত। এইরূপে দুই, তিনবার টিকা দিলে বসন্ত রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় থাকে না।

৪। বসন্তের মারিভয় উপস্থিত হইলে পূর্বের টিকা কবে দেওয়া হইয়াছে তাহা বিচার না করিয়া, অবিলম্বে আবার টিকা দেওয়া উচিত।

৫। বসন্তের মারিভয় কালে প্রত্যেক শিশুর, এমন কি সদ্যোজাত শিশুরও, টিকা দেওয়া উচিত। বাস্তবিক শিশুদের এই রোগ হইবার সম্ভাবনা বড় বেশি।

৬। কোন ব্যক্তির বসন্ত হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে টিকা দিবে। ইহাতে ঐ রোগ না হইবার সম্ভাবনা ; আর হইলেও তাহা তত মারাত্মক হয় না। যদি বসন্ত-বিষ শরীরে ২।৩ দিন মাত্র পুর্বে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে টিকা দিলে সেই বিষ দমন হয় ও রোগ নিবারিত হয় ; কিন্তু বিলম্ব করিয়া টিকা দিলে রোগ আটকান যায় না।

৭। কোন বাটীতে বসন্ত রোগী থাকিলে সেখানকার শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, দাস, দাসী সকলেরই টিকা লওয়া উচিত।

চিকিৎসা।—সুসাধ্য বসন্ত হইলে রোগীর জন্য সুপথ্য, বিশ্রাম ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা ব্যতীত বেশি কিছু চিকিৎসার দরকার হয় না। রোগ কঠিন হইলে সুচিকিৎসকের সাহায্য লইবে। গায়ের ঘা গুলি যত্ন করিয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং আবশ্যক মত ঔষধ মিশ্রিত তৈল বা মলম ব্যবহার করিবে। রোগীর সেবার সুবন্দোবস্ত দরকার এবং তাহার উপরেই রোগীর জীবনরক্ষা নির্ভর করে।

বাটীতে কাহারও বসন্ত হইলে শীঘ্র কর্তৃপক্ষীয়দিগকে সংবাদ দিবে। বসন্ত রোগীর জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। নিজ বাটীতে ঈদৃশ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া চিকিৎসা সম্ভব না হইলে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিবে। ইহাতে গৃহস্থ ও রোগী উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয় এবং প্রতিবেশিগণের আশঙ্কা দূর হয়। হাসপাতালের প্রশস্ত বায়ুসঞ্চালিত গৃহে অবস্থান, শিক্ষিত পরিচর্যাকারীর শুশ্রূষা ও অন্যান্য অনুকূল বন্দোবস্তের সাহায্যে রোগীর উপকার হয়। গৃহে রোগীর মলমূত্রাদি ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদির সম্যক বিশোধন করা সহজ নয় এবং তাহা না করিলে রোগ সংক্রামিত হইয়া পড়ে।

৪। **কলেরা।**—ইহাও সংক্রামক ব্যাধি এবং বাংলাদেশে বহুলোক এইরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রায় সকল ঋতুতেই ইহা দেখা যায়, পরন্তু গ্রীষ্মকালেই ইহার আধিক্য হয়।

কলেরার বিষ কোন প্রকারে উদরস্থ হইলে সচরাচর তিন দিনের মধ্যেই রোগ প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন ইহা দশ দিন পর্যন্তও যাপ্য থাকিতে দেখা গিয়াছে।

রোগের প্রারম্ভে উপর্যুপরি প্রবলবেগে তরল ভেদ ও বমন হইতে থাকে, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, রোগী পিপাসায় কাতর হইয়া পড়ে। ক্রমে গাত্রদাহ, অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়; শীঘ্রই রোগীর স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়, চোখ মুখ বসিয়া যায়, হাতে পায়ে ও পেটে খিল ধরে এবং নাড়ী ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় হয়। এই রোগে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, এমন কি চারি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেও, মৃত্যু সংঘটিত হইতে দেখা যায়। সাধারণত তিন চারি দিন কাটিয়া গেলে রোগীর বাঁচিবার আশা হয়। কিন্তু কাহারও কাহারও তাহার পরেও প্রস্রাব না হওয়ায় রক্ত দূষিত হইয়া পড়ে এবং বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়; এইরূপ অবস্থা হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন।

'কমা' (comma) নামক জীবাণুই কলেরার কারণ। ইহা রোগীর মলের সহিত মিশ্রিত থাকে এবং তাহার অণুমাত্র উদরস্থ হইলে এই রোগ উদ্ভূত হইতে পারে। ঐ জীবাণু দ্বারা দূষিত জল বা দুগ্ধ পান করিয়াই প্রায় এই রোগ হয়। মেলা বা বহু জনসমাগম স্থলে অনেক সময় এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। জনতার মধ্যে কাহারও কলেরা হইলে তাহার মল ও বমনাদি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয় না, বরং অনাবৃত স্থানে তাহা পরিত্যক্ত হয়। তখন সহজেই এই ব্যাধি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মক্ষিকা, পিপীলিকা ও কীট-পতঙ্গ কলেরা রোগীর পরিত্যক্ত মল ও বমনাদির সংস্পর্শে আসিবার পর খাদ্যদ্রব্যাদিতে বসিলে সেগুলি দূষিত হয়। কলেরার প্রাদুর্ভাব কালে ঐ কারণে সহজেই বাজারের খাদ্যদ্রব্যাদি দূষিত হইয়া থাকে এবং না জানিয়া ঐরূপ

খাদ্য উদরস্থ করিয়া লোকে কলেরা রোগাক্রান্ত হয়। কখন বা শুশ্রূষাকারীদের অসাবধানতায় তাহাদের হস্ত ও পরিধেয় বস্ত্রাদি দ্বারা কলেরার জীবাণু আহার্য বা পানীয় দ্রব্যে মিশ্রিত হয়। গৃহস্থের অসাবধানতায় জালা, কলসী ইত্যাদির জলে সহজেই কলেরা জীবাণু সংক্রামিত হইতে পারে। রোগীর মল ও বমনাদি দ্বারা দূষিত বস্ত্র, শয্যা ও পাত্রাদি কূপ বা পুষ্করিণীতে ধৌত বা নিক্ষিপ্ত হইলে উহার জল দূষিত হয়। ঐ জলে কলেরার জীবাণু অতি শীঘ্রই অগণিত সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত জলাশয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। জলাশয়ের ধারে রোগীর মল ও বমনাদি নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতেও জল দূষিত হইবার সম্ভাবনা। কোন গ্রামের বা জনসমাগম স্থানের পানীয় জল ঐরূপে দূষিত হইলে সেই জল পান করিয়া বহু লোক কলেরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

প্রতিরোধ।—কলেরা প্রতিরোধ করিতে হইলে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক; তন্মধ্যে পানীয় জল, দুগ্ধ ও অন্যান্য আহার্যের নির্মলতা ও বিশুদ্ধতার দিকে সর্বতোভাবে দৃষ্টি রাখাই প্রথম ও প্রধানতম। জল বেশ করিয়া সিদ্ধ করিয়া পান ও ব্যবহার করা কর্তব্য। বাটীর নিকটস্থ কূপ ও পুষ্করিণী পটাস পারম্যাঙ্গানেট নামক ঔষধ দ্বারা বিশোধিত করিয়া লইবে। বাজারের খাবার খাওয়া একেবারেই বন্ধ করিবে এবং তরিতরকারি, পান ও ফলমূলাদি পরিষ্কার রূপে ধৌত করিয়া লইবে। স্মরণ রাখিবে যে পানের সহিতও কলেরার জীবাণু মুখে প্রবেশ করিতে পারে। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় সকল প্রকার দুষ্পাচ্য খাদ্য,

এবং নিমন্ত্রণ খাওয়া, পরিত্যাগ করিবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ ও অন্যান্য শারীরিক অনিয়ম বন্ধ করিবে। কাহারও অজীর্ণ বা উদরাময়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্রই তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক। পাত্রাদিতে বা খাদ্যে পিপীলিকা, মক্ষিকাদি যাহাতে না বসে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে, এবং উত্তমরূপে হাত না ধুইয়া খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিবে না। নখ বড় থাকিলে তাহার ভিতর ময়লা জমিয়া থাকে ও তাহার সহিত কলেরার জীবাণু খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসিয়া উদরস্থ হইতে পারে, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। কলেরা রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকিলে, পান ও ভোজনের পূর্বে জীবাণুনাশক বিশোধক লোশনে হস্ত ধৌত করিবে। কলেরা রোগীকে নির্দিষ্ট পাত্রে বমন ও মলত্যাগ করাইবে; সেই পাত্রে কোন প্রকার বীজঘ্ন ঔষধ ঢালিয়া দিবে এবং অবিলম্বে উহা বাহিরে লইয়া গিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে। ঐ ময়লা যেখানে সেখানে নিক্ষেপ না করিয়া গভীর মাটির নীচে পুতিয়া ফেলা অথবা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলা উচিত। যেখান হইতে লোকে পানীয় জল গ্রহণ করে, তাহার নিকটবর্তী স্থানে কলেরা রোগীর মল বমনাদি কখনও নিক্ষেপ বা প্রোথিত করিবে না। কলেরা রোগীর শবদেহ শীঘ্র দাহ করিয়া ফেলিবে অথবা চুনের সহিত মৃত্তিকাভ্যন্তরে গভীর গর্ত করিয়া প্রোথিত করিবে।

চিকিৎসা।—কলেরার কোন অব্যর্থ ঔষধ আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। রোগের সর্ব প্রথম অবস্থায় ২০ মিনিট অন্তর জলের সহিত ২৫।৩০ ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড ডাইলিউট (Acid Sulph. Dil.) অথবা স্পিরিট ক্যামফর (Spt. Camphor)

১০।১৫ ফোঁটা দুই তিন বার সেবন করা মন্দ নহে। ক্লোরোডাইন প্রভৃতি ঔষধে আফিম থাকায় তরল ভেদ রোধ করিতে পারে, কিন্তু কলেরায় আফিম বিধেয় নহে। রোগ প্রকাশ পাইলেই চিকিৎসকের সাহায্য লইবে এবং সেই সংবাদ স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি বা বোর্ডকে অনতিবিলম্বে জ্ঞাপন করা সকল গৃহস্থেরই উচিত। কলেরা রোগীকে একটি স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবে এবং শুশ্রূষাকারী ব্যতীত রোগীর ঘরে অন্য কাহারও না থাকাই শ্রেয়। আবশ্যক হইলে যত শীঘ্র সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে লইয়া যাইবে। অনেক সময় বাটীতে সুচিকিৎসার অভাবে রোগীর মৃত্যু সংঘটিত হয়, তাহা স্মরণ রাখা উচিত।

রোগীর চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীর উত্তপ্ত রাখিতে সতত চেষ্টা করিবে এবং অবসন্নতা দেখিলে তাহা নিবারণের ব্যবস্থা করাইবে। রোগীর হাতে পায়ে যখন খাল ধরিতে থাকে, তখন ঐ সকল স্থানে সেঁক দেওয়া অথবা ঘর্ষণ করায় উপকার পাওয়া যায়। কলেরা রোগীর দেহ হইতে রক্তের জলীয় ভাগ এত অধিক নির্গত হইয়া যায় যে রক্ত গাঢ় হইয়া পড়ে এবং তাহার চলাচলের ব্যাঘাত জন্মে। এইজন্য রোগীকে প্রচুর পরিমাণে জল খাইতে দিবে; বরফও যত ইচ্ছা খাইতে দিতে পার। আধুনিক চিকিৎসাপ্রণালীতে কলেরা রোগীকে স্যালাইন ইন্‌জেকশন (saline injection) বা পিচকারির সাহায্যে লবণাক্ত জল রক্তের সহিত মিশাইয়া দিবার প্রথা চলিয়াছে; ইহাতে অনেক সময় বিশেষ ফল পাওয়া যায়; অতি শঙ্কটাপন্ন রোগীরও ইহার দরুণ প্রাণরক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে।

কলেরা রোগীকে জল ব্যতীত অন্য কিছুই খাইতে দিবে না। পীড়ার একটু উপশম হইলে জল-বার্লিতে লেবুর রস ও চিনি মিশাইয়া কিংবা ছানা-কাটান দুগ্ধের জল দিতে পারা যায়। ক্রমে দধি হইতে মাখন তুলিয়া ফেলিয়া সেই ঘোলের শরবৎ খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।

কলেরার টিকা।—টিকা দিয়া কলেরার আক্রমণ প্রতিরোধ করা অধুনা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাতে উপকার হয় বটে, কিন্তু ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না বলিয়া, ইহার বেশি প্রচলন হয় নাই। কলেরা ব্যাপকরূপে প্রকাশ পাইলে অথবা কলেরা রোগীর সংস্পর্শে আসিতে হইলে এইরূপ টিকা লওয়া যুক্তিসংগত।

৫। **রক্তামাশয়।**—রক্তামাশয় বা ডিসেন্ট্রি (dysentery) রোগে বৃহৎ অন্ত্রের ভিতর ক্ষত উৎপন্ন হয়। ক্ষতগুলি ছোট ছোট বা বিস্তৃত হইতে পারে এবং সেগুলি হইতে রক্ত, ক্লেদ ও শ্লেষ্মা বাহির হয়। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র জ্বর হয় ও পেটের অসহ্য মোচড় ও কামড়ানি হয় এবং নিদ্রা ও বিশ্রাম প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনবরত অল্প অল্প করিয়া রক্ত ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত দাস্ত হইতে থাকে এবং রোগী যাতনায় কাতর হইয়া পড়ে।

দুইটি বিভিন্ন কারণে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন বা 'আমিবা' (amaeba) নামক কীটাণু হইতে ইহা উৎপন্ন হয়, এবং কোন কোন স্থলে রক্তামাশয়ের জীবাণু ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। দাস্তের ময়লা অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া রোগের যথার্থ কারণ নির্ণয় করা যায়। আমিবা-জনিত রক্তামাশায় হইতে কখন কখন যকৃতের ভিতর স্ফোটক

হইয়া পড়ে। যাহারা জনাকীর্ণ স্থানে অপরিষ্কার ভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে এবং দূষিত জল ও অবিশুদ্ধ খাদ্য বা পানীয়াদি গ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে রক্তামাশয় ব্যাধি প্রায় দেখা যায়।

প্রতিরোধ।—এই রোগ প্রতিরোধ করিতে হইলে খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। দূষিত জল বা দুর্গন্ধ ও অবিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যাদি সর্বতোভাবে বর্জন করিবে। সুসিদ্ধ ও সহজে পরিপাক হয় এমন খাদ্য গ্রহণ করিবে। কাঁচা শাক-সব্‌জি বা ফল বিশুদ্ধ জলে ভাল করিয়া না ধুইয়া খাইবে না এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে উন্মুক্ত স্থানে বাস করিবে। বাটীতে রক্তামাশয়ের রোগী থাকিলে তাহার মল যত শীঘ্র সম্ভব নষ্ট করিয়া ফেলিবে; উহা পোড়াইয়া ফেলিলে ভাল হয়; উহাতে মাছি ইত্যাদি বসিয়া অন্যত্র রোগ বিস্তার না করে সেদিকে নজর রাখিবে।

চিকিৎসা।—রোগীকে শয্যায় শায়িত রাখিবে এবং মলত্যাগ কালেও উঠিতে দিবে না। বারবার দাস্ত হওয়ায় তাহাকে বড়ই বিব্রত হইতে হয়, সেজন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। রোগীকে গরমে রাখিবে এবং পেটের উপর ঢাকা দিবে। প্রথম অবস্থায় রেড়ির তৈলের জোলাপে উপকার হইতে পারে এবং তাহার ব্যবহার মন্দ নহে। চিকিৎসার প্রণালী স্থির করিবার জন্য দাস্তের ময়লা পরীক্ষা করাইবে। আমিবার অস্তিত্ব জানা গেলে তখনি এমিটিন (emetine) নামক ঔষধের পিচকারি লওয়া উচিত। উহাতে আশ্চর্য উপকার হয় এবং শীঘ্রই রোগ ভাল হইয়া যায়। কিন্তু রোগ জীবাণুঘটিত হইলে এমিটিনে ফল

হয় না। তখন নানাবিধ ঔষধ ব্যবহৃত হয় এবং সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থার উপর ধৈর্যসহকারে নির্ভর করিতে হয়।

৬। **খোস পাঁচড়া**।—হাত পায়ের আঙুলের গলিতেই প্রায় খোস পাঁচড়া হইতে দেখা যায়। হাতের কব্জি ও কনুইয়ে এবং পাছা, উরু, প্রভৃতি স্থানেও ইহা অনেক সময় হয়। এই রোগের কারণ এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট; নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে এগুলি খালি চোখেও দেখা যায়। তাহারা চামড়ার ভিতর গর্ত করে ও সেখানে ডিম পাড়ে, এবং সেই ডিমগুলি হইতে কীট উৎপন্ন হয়। খোস পাঁচড়া স্পর্শাক্রামী ব্যাধি। ইহা বড় চুলকায় এবং তাহাতে শীঘ্রই ইহার বিস্তার হয় এবং সহজেই ইহা একজনের শরীর হইতে অন্য শরীরে যাইয়া পড়ে। ইহা প্রবল হইলে অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত অনেকগুলি ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং হস্ত পদের অঙ্গুলি সমস্তই বড় বড় খোসে ভরিয়া যায়।
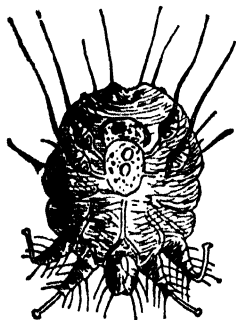
খোসের কীট

চিকিৎসা।—খোস পাঁচড়ার প্রতীকারের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ গন্ধক। গন্ধকে খোসের পোকা মরিয়া যায় এবং আবশ্যক হইলে সর্বাঙ্গে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা লাগাইবার পূর্বে ঘাগুলি গরমজলে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করিয়া লইবে। ঘৃত বা নারিকেল তৈলের সহিত গন্ধকের কিংবা জিংক্ অক্সাইডের (zinc oxide) গুঁড়া মিশাইয়া খোসের উপকারী মলম প্রস্তুত হয়। ইহা কয়েকদিন লাগাইলেই উপকার পাওয়া যায়।

হাইড্রার্জ এমোনিয়েটম ও তদ্রূপ ঔষধের মলমে বেশ আশু উপকার হয়, কিন্তু বিষাক্ত ঔষধযুক্ত মলম ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ব্যবহার করা উচিত নয়। রোগীর পরিহিত বস্ত্র প্রত্যহ উত্তপ্ত জলে ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া ও সাবান দিয়া কাচিয়া লইবে।

৭। **উকুন**।—উকুন প্রায়ই মাথার চুলের গোড়ায় জন্মিয়া থাকে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানেও কখন কখন দেখা যায়। ইহারা যেখানে থাকে, সেখানে রাত্রি দিন সুড় সুড় করে এবং প্রদাহ জন্মে। বড় উকুনকে বরং সহজে মারা যায়, কিন্তু উহাদের ডিম বা নিকি এমন ভাবে লাগিয়া থাকে যে, তাহাদিগকে দূর করা সুকঠিন। পারদ ঘটিত মলম এবং কার্বলিক অ্যাসিড ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাথা আঁচড়াইয়া পরিষ্কার করিলে কতক কতক
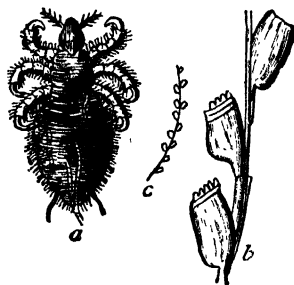
উকুন, নিকি ও ডিম

উকুন এবং নিকি পড়িয়া যায়। কীটঘ্ন ঔষধ মিশ্রিত যে সব সাবান আছে তাহা ব্যবহারে উপকার হয়। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে এই রোগ জন্মিতে পারে না।

৮। **দাদ**।—দাদ প্রায়ই মানুষের কুঁচকিতে, উরুতে ও বগলে চর্মের উপর হয়। কখন কখন ইহা মুখে, মাথায়, নখের গোড়ায় বা অন্যান্য স্থানেও দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত চুলকায়; সেই চুলকানি বন্ধ করা শক্ত। রাত্রিতে ইহা বড় কষ্টকর হয়, এমন

কি নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়। সর্বদাই একটা অসুখ বোধ হইতে থাকে এবং তাহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে। ইহাও একটি স্পর্শক্রামী চর্মরোগ এবং সহজেই বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। গোয়া পাউডার বা ক্রাইসোফেনিক অ্যাসিডের (crysophanic acid) মলম দাদের অতি উপকারী ঔষধ। উহা কয়েকদিন লাগাইলেই দাদ ভাল হইয়া যায়। কিন্তু ঐ ঔষধ কাপড়ে লাগিলে কাপড় নষ্ট হইয়া যায়, অতএব সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। কিছুদিন টিঞ্চার আইওডিন এবং কার্বলিক লোশন ব্যবহারেও দাদের উপকার হইতে পারে। পারদ কিংবা তাম্র ঘটিত ঔষধের মলমেও উপকার দর্শে। এসেটিক অ্যাসিড (acetic acid) লাগাইলে দাদ সারে, কিন্তু বড় জ্বালা করে।

৯। **চক্ষুর প্রদাহ।**—চক্ষু-গোলকের সম্মুখের প্রায় সমুদায় শ্বেত অংশ এবং উপর নীচের অক্ষি-পল্লবের পিছন দিক ব্যাপিয়া এক অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লীর আবরণ আছে। উহা অতীব অসহনশীল ও সূক্ষ্ম রক্তবাহী-নলীতে ভরা এবং সামান্য কারণে তাহাতে প্রদাহ জন্মে। ইহার নাম কন্‌জন্‌টাইভা এবং ইহার প্রদাহের নাম কন্‌জন্‌টিভাইটিস (conjunctivitis)। চক্ষু অতীব সুকোমল যন্ত্র এবং তাহা অক্ষিপত্র দ্বারা সুরক্ষিত; কিন্তু তথাপি চক্ষুর অসুখ প্রায়ই দেখা যায়।

বাতাসের ধুলা হইতে বা অন্য কোনরূপে চোখে কিছু পড়িলে কত শীঘ্র চোখ লাল হইয়া পড়ে এবং জল পড়িতে থাকে, তাহা সকলেরই জানা আছে। চক্ষুতে এইরূপ প্রদাহ জন্মিবার প্রবণতা কাহারও কাহারও বড় বেশি দেখা যায় এবং অতি তুচ্ছ কারণে

চোখ লাল হইয়া পড়ে। নানা কারণে চোখের ঐ কন্জন্
রক্তাধিক্য হয় এবং শীঘ্র সেই কারণ দূরীভূত না হইলে ক্রমে সেথায় প্রদাহ জন্মে। তখন ঐ ঝিল্লী হইতে নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়, যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং চক্ষু ফুলিয়া উঠে। চলিত কথায় ইহাকে "চোখ ওঠা" বলে। চোখের পাতার ভিতর ও সম্মুখের সমস্ত অংশই রক্তে ভরিয়া লাল হইয়া উঠে। চোখে আলোক সহ্য হয় না, সর্বদা ভিতরে কর্ কর্ করে এবং শ্লেষ্মায় পাতায় পাতায় জুড়িয়া যাওয়ায় চোখ খুলিতে কষ্ট হয়। প্রদাহ কিছুদিন স্থায়ী হইলে চোখের স্থানে স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং তখন কষ্টকর লক্ষণাদি বাড়িয়া যায়।

চোখের প্রদাহ কোন দূষিত কারণ হইতে উৎপন্ন হইলে শীঘ্র সারে না। পুরাতন প্রদাহের ফলে চোখের উপর ও চোখের পাতার ভিতরের আবরণটি সর্বত্র দানা দানা যুক্ত হইয়া পড়ে। চোখে একবার ক্ষত হইলে শীঘ্র তাহা সারে না এবং কর্ণিয়া (৪৬ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ) নামক স্থানে ক্ষত জন্মিলে কখন কখন দৃষ্টির ব্যাঘাত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বায়ুস্থিত ময়লা হইতে চোখে এই প্রদাহ জন্মিতে পারে। যখন কোন দুষ্ট জীবাণু হইতে চোখের ঝিল্লীতে ঐরূপ প্রদাহ উৎপন্ন হয় তখন রোগ সংক্রামক হইয়া পড়ে। এক চোখ হইতে ঐ রোগ অন্য চোখে গিয়া পড়ে এবং যাহারা রোগীর সংশ্রবে আসে তাহাদেরও চোখ আক্রান্ত হয়। এইরূপে চোখ ওঠা রোগে কোন পরিবারস্থ সকলকেই এক সময়ে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। বোর্ডিং ইত্যাদিতে, যেখানে অনেকে একত্র

থাকে সেখানে, চোখের এইরূপ সংক্রামক রোগে অনেকে এক সময়ে আক্রান্ত হয়।

ছোট ছোট শিশুদের ভিতর চোখের অসুখ অনেক দেখিতে পাওয়া যায় এবং অসাবধানে কাহারও কাহারও চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। হাতুড়িয়ার হাতে পড়িয়া কত লোক যে বাংলাদেশে কুচিকিৎসায় চক্ষু হারায় তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহা বন্ধ করার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

প্রতিরোধ :—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, ময়লা ও ধূলিপূর্ণ বায়ু হইতে এবং চক্ষুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি হইতে দূরে থাকা দরকার। স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে বা দেহের দুর্বল অবস্থায় চোখের অসুখ শীঘ্র আসিয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব সর্বদা নিজের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যও চক্ষুকে নিরাপদ রাখিতে যত্নবান থাকিবে।

চিকিৎসা।—চোখের অসুখ হইলে বা লক্ষণ দেখা গেলেই সাবধানে চিকিৎসা করাইতে হইবে; নতুবা উহা হইতে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া ক্রমে চোখের বিষম ক্ষতি হয়। সময়ে চিকিৎসা না করাইয়া অনেকে শেষে বহু কষ্ট পায়। রোগীকে ময়লা স্থান, ধূম ও রৌদ্র হইতে সরাইয়া পৃথক রাখিবে। চোখ সর্বদা পরিষ্কার রাখার জন্য ব্যবস্থা করিবে। বোরিক (boric) লোশন দ্বারা নিয়মিত ভাবে চোখ ধুইয়া দিবে এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থা মত সেথায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোকেন (cocaine) একটি মহৌষধ, উহার লোশনে কষ্টের অনেক লাঘব হয়। তীব্র ঔষধ প্রয়োগে চোখের ক্ষতি হইতে পারে তাহা স্মরণ রাখিবে এবং বিজ্ঞ চিকিৎসক ভিন্ন অন্যের কথায় কিছু করিবে না।

১০। **বেরিবেরি।**—এই ব্যাধি প্রায়ই ধীরে ধীরে আক্রমণ করে। জ্বর প্রায়ই দেখা যায় না, কিন্তু রোগী ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়ে, হজম শক্তি কমিয়া যায় ও রক্তাল্পতা আসিয়া পড়ে। কাজ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং শীঘ্রই উঠিতে বসিতে কষ্ট হয়। প্রায়ই বুকে ব্যথা অনুভূত হয় এবং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় ও নাড়ী দ্রুত হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই পদদ্বয়ে শোথ দেখা দেয় ও মাংসপেশীতে বেদনা অনুভূত হয়। কখন কখন স্থানে স্থানে স্পর্শানুভূতির ক্ষমতা কমিয়া যায়। বেরিবেরিগ্রস্ত অনেক রোগী হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়ারও ব্যতিক্রমে কষ্ট পাইয়া থাকে। ঐরূপ লক্ষণাদি প্রবল হইলে সহসা মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা। বেরিবেরি রোগে প্রায়ই চক্ষুর ভিতরে গ্লকোমা (glaucoma) রোগ আসিয়া পড়ে; তাহাতে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইতে পারে।

পূর্বোক্ত লক্ষণাদির অনুরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট পীড়া কখন কখন বহু ব্যাপক ভাবে দেখা যায় এবং তাহাকে "এপিডেমিক ড্রপসি", (epidemic dropsy) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। উহা একসঙ্গে বহু লোককে আক্রমণ করে তাহা কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে মাঝে মাঝে দেখা গিয়াছে। প্রকৃত কারণ নির্ণয় না হওয়ায় এগুলি একই ব্যাধি কি বিভিন্ন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন।

কি কারণ হইতে বেরিবেরি রোগের উৎপত্তি হয় তাহা এখনও নির্ণয় করা যায় নাই, কিন্তু অনেকে সন্দেহ করেন যে অবিশুদ্ধ বা দূষিত খাদ্য দ্রব্যাদির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ভাইটামিন সংযুক্ত সুখাদ্যের অভাবে এই ব্যাধি উৎপন্ন

হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। যাহাদের চাউলই প্রধান খাদ্য তাহাদের ভিতর বেরিবেরির সংখ্যা বেশী, কিন্তু অন্যের ভিতরেও এই রোগ দেখা গিয়াছে। কলে ছাঁটা চাউল বা গম হইতে ভাইটামিন চলিয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ সেরূপ চাউল বা ময়দা এই রোগের কারণ বলিয়া সন্দেহ করেন। দূষিত বা পচা চাউল, ভেজাল দেওয়া সরিষার তেল ইত্যাদিও কেহ কেহ ইহার কারণ বলিয়া নিরূপণ করেন।

প্রতিরোধ।—এই ব্যাধির প্রকৃত কারণ নির্ণয় না হইলেও ইহার নিবারণার্থ অবিশুদ্ধ বা দূষিত বা ভেজাল দেওয়া খাদ্যদ্রব্য সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা কর্তব্য। ভাইটামিন আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অতীব আবশ্যক; অতএব টাটকা শাক-সবজি, তরিতরকারি, ফল ইত্যাদি ভোজন করা যুক্তিসংগত। কলে ছাঁটা চাউল বা কলের সাদা ময়দা অপেক্ষা ঢেকি ছাঁটা চাউল ও হাতে-পেষা আটা ব্যবহারই প্রশস্ত। টিনের কৌটায় বহু দিন রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার না করাই ভাল। ময়রার দোকানের নিকৃষ্ট খাবার খাইবে না। যাহাতে পরিপাকের কোন ব্যাঘাত হইতে পারে এমন খাদ্য পরিহার করিবে।

চিকিৎসা।—বেরিবেরি রোগীর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বিশ্রামের সম্পূর্ণ প্রয়োজন। দৌড়াদৌড়ি করা, উপর নীচে করা একেবারে উচিত নহে। যতক্ষণ সম্ভব শয়ন করিয়া বা বসিয়া কাটান কর্তব্য। স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া যতদূর সম্ভব রৌদ্র ও উন্মুক্ত বায়ু উপভোগ করিবে। প্রচুর পরিমাণে সহজ পাচ্য টাটকা খাদ্যাদি গ্রহণ করিবে এবং হজমের ব্যাঘাত না হয়

সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। বাটীতে গরু থাকিলে এবং দুধ নোংরা হইবার ভয় না থাকিলে, কাঁচা দুগ্ধ খাইবে; উহাতে ভাইটামিন বেশি পাওয়া যায়।

ঔষধ হিসাবে ক্যালসিয়ম (calcium lactate) ব্যবহৃত হয়। উহা কিছুদিন ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার হয়। ভাইটামিন সংশ্লিষ্ট কতকগুলি পেটেণ্ট ঔষধ উঠিয়াছে। কিন্তু পথ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে ঐ সব প্রায় আবশ্যক হয় না। হৃদ্‌যন্ত্রের বা শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়াদির ব্যাঘাত জন্মিলে চিকিৎসকের সাহায্যে ব্যবস্থা করাইবে।

১১। **হাম**।—হাম বা মিজিল্‌স্ (measles) অতীব সংক্রামক ব্যাধি; ইহা জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়। হাম হইতে মৃত্যুর সংখ্যা কম বটে, কিন্তু প্রায়ই ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রোগ আসিয়া বিপদ ঘটায়। অল্প বয়সের বালকবালিকাদের মধ্যে ইহার প্রসার বেশি দেখা যায়।

ইহার আক্রমণে জ্বর হয় এবং তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে গাত্রে লাল লাল স্ফোট বাহির হয়; সেগুলি দেখিতে পিনের মাথার মত। প্রথমে তাহা প্রায়ই ললাট ও মুখে দেখা দেয় এবং পরে সর্বদেহে ব্যাপিয়া পড়ে। রোগীর নাক মুখ ঝামরায় এবং প্রায়ই কাসি সর্দি হইয়া পড়ে। স্ফোটগুলি বেশ বাহির হইবার পর ক্রমে জ্বর কমিয়া যায় এবং প্রায় দশ দিনের মধ্যে হাম সারিয়া যায়। পেটের পীড়া এবং ফুস্‌ফুসের প্রদাহ হইলে রোগীর আরোগ্য লাভের ব্যাঘাত হয়।

প্রতিরোধ।—ইহা অতীব সংক্রামক জানিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ

পৃথক করিয়া রাখার বন্দোবস্ত করিবে। নতুবা বাটীর অন্যান্য বালক বালিকারা সকলেই ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িবে। রোগীর বিছানা পরিষ্কার রাখিবে এবং পরিচ্ছন্নতার দিকে সাধ্য মত দৃষ্টি রাখিবে। তাহার ব্যবহৃত কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য অন্যের সংস্পর্শে যাইতে দিবে না। বাটীর অন্যান্য বালক-বালিকাদিগকে রোগীর নিকট আসিতে দিবে না।

চিকিৎসা।—নির্মল বায়ু-সঞ্চরণ-যুক্ত ঘরে রোগীকে রাখিবে, কিন্তু বায়ু প্রবাহ হইতে সরাইয়া তাহার বিছানা করিবে। ঔষধের প্রায় দরকার হয় না, কিন্তু কোন উপসর্গ দেখা দিলে তখনি চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। রোগীকে দুগ্ধ ও বার্লি বা তদনুরূপ খাদ্য পথ্য করিতে দিবে। কুপথ্য হইতে পেটের পীড়া হইতে পারে তাহা স্মরণ রাখিবে।